সৌরভ

সচিত্র মাসিক পত্র ও সমালোচন।

—সম্পাদক—

শ্রীকেদারনাথ মজুমদার।

—পঞ্চম বর্ষ—

কার্ত্তিক ১৩২৩ হইতে আশ্বিন ১৩২৪।

ময়মনসিংহ।

বার্ষিক মূল্য— দুই টাকা।

PUBLISHED FORM
RESEARCH HOUSD—MYMENSINGH.

৭৭৭৫

সৌরভ

পঞ্চম বর্ষ } ময়মনসিংহ, কার্ত্তিক, ১৩২৩। { প্রথম সংখ্যা।

বাঙ্গলা সাধুভাষা।

(বংশাহর সাহিত্য সম্মিলনে পঠিত।)

আজকাল বহু কৃতবিদ্য বাঙ্গালী বঙ্গভাষার উন্নতিকল্পে নানারূপ আলোচনা করিতেছেন। ইহাতে আমাদের স্বদেশ প্রীতিরই পরিচয় পাওয়া যায়; কেননা বাঙ্গলা ভাষাটা আমাদের দেশেরই বস্তু এবং দেশের সর্ব্ববিষয়ের উন্নতির ইচ্ছা এবং চেষ্টার নামই স্বদেশ প্রীতি।

কিন্তু বাঙ্গলা ভাষার উন্নতি কিরূপে হইবে তদ্বিষয়ে দুইটা পরস্পর বিপরীত মত দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। পুরাতন দলের সংক্ষিপ্ত মত এই যে যাহাকে আমরা সাধুভাষা বলি এবং সাধারণতঃ সাহিত্যে যাহা প্রচলিত আছে তাহাই সাহিত্যিক ভাষা হওয়া উচিত। পরিপন্থী দল বলেন যে প্রচলিত প্রাদেশিক ভাষাই সাহিত্যে ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। ভাষা বিষয়ে এইরূপ মতভেদ সাহিত্যিক সমাজেরই আলোচ্য বিষয় সুতরাং আমি এই উভয় মতের পোষকতায় এবং খণ্ডনপক্ষে যে সকল যুক্তি আমার মনে উদিত হইয়াছে তাহা এই সম্মিলনে উপস্থাপিত করিলাম।

পূর্ব্বে যাঁহারা এই বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেন তাঁহারা কেবল বাঙ্গলা সাহিত্যে সংস্কৃত শব্দ প্রচলিত হইবে, না প্রচলিত বাঙ্গলা শব্দ ব্যবহৃত হইবে, ইহাই বিচার করিতেন—আমরা পুষ্করিণী লিখিব কি পুকুর লিখিব, বদরী লিখিব কি কুল লিখিব, চালতা লিখিব কি চারিত্র বা ভব্য লিখিব ইহাই তাঁহাদের বিচার্য্য বিষয় ছিল। কিন্তু আমার বোধ হয় প্রাদেশিক শব্দ কেন, সম্পূর্ণ বিদেশী শব্দও ভাষায় প্রবেশ করিলে সাহিত্যিক ভাষার কোন অনিষ্ট হয় না। কত দ্রাবিড় শব্দ, গ্রীক শব্দ, আরবী শব্দ সংস্কৃতে প্রবেশ করিয়াছে—যথা—ঘট, কুঠার, কেন্দ্র, জামিত্র, হোরা, বণিক্, ত্রিকোণ প্রভৃতি। ইহাতে সংস্কৃত ভাষার কিছুমাত্র অনিষ্ট হয় নাই। বাঙ্গলায় হিসাব, বিছানা, বালিশ, আলমারি, বাক্স, কৈফিয়ৎ, লণ্ঠন, তক্তপোষ, চেহারা, খারাপ প্রভৃতি কত শত শব্দ প্রবেশ লাভ করিয়া তাহার অঙ্গীভূত হইয়াছে। ইহাতেও বাঙ্গলার অনিষ্ট হয় নাই। কেননা কোন ভাষায় বিদেশী শব্দ প্রবেশ করিলে সেই ভাষার বিশেষত্ব নষ্ট হয় না। আমরা যেমন হ্যাট কোট পরিলে ও বাঙ্গালীই থাকি তেমনই আমাদের কথাবার্ত্তায় বহু বিদেশী শব্দ ব্যবহৃত হইলেও আমাদের ভাষা বাঙ্গলাই থাকে। হ্যাট কোট পরিহিত বাঙ্গালীকে সাহেব বলিয়া ভ্রম হইতে পারে, কিন্তু হ্যাট কোট খুলিলেই বাঙ্গালীত্ব বাহির হইয়া পড়ে। সেইরূপে ইংরেজী শিক্ষিত বাঙ্গালীরা বাঙ্গলায় কথা কহিবার সময়ে যথাসাধ্য ইংরেজী শব্দ ব্যবহার করিলেও তাঁহাদের কথায় এমন কতকগুলি বাঙ্গলা শব্দ অবশিষ্ট থাকে, যাহা পরিবর্ত্তনসহ নহে। কেননা সেই শব্দ কয়েকটারও ইংরেজী করিলে তাঁহাদের কথাকে আর বাঙ্গলা বলা যায় না। কয়েকটা দৃষ্টান্তের সাহায্যে আমার অর্থটা স্পষ্টীকৃত হইবে। "তোমার uncle যদি এখানে আসিতেন তাহা হইলে এখানকার climate এবং natural scenery দেখিয়া delighted হইতেন আর তাঁহার old friend এর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হইত।" "এই মকদ্দমায় appeal এর কোন

ground নাই।" এই দুইটী বাক্যের পারসী শব্দটীর এবং ইংরেজী শব্দগুলির পরিবর্ত্তে সংস্কৃত, লাটিন, ফ্রেঞ্চ প্রভৃতি যে কোন ভাষার শব্দ ব্যবহৃত হইতে পারে। এইগুলি সাধারণত নাম ও বিশেষণ। নাম যাহাই হউক না কেন বস্তুটা তাহাই থাকে। "গোলাপ যে নামে ডাক সুবাস বিতরে।" কত লোকের অর্থশূন্য নাম আছে যথা পাঁচকড়ি, নকড়ি, বেনোআরি, কুঞ্জলাল, ছাতুলাল ইত্যাদি। আবার বিদেশী নামও আছে যথা মাইকেল দত্ত, গুডিব চক্রবর্ত্তী, বেঞ্জমিন বড়ুআ. দীল-মহম্মদ গাঙ্গুলী ইত্যাদি। অথচ তাহাতে তাহাদের ব্যক্তিত্ব যায় নাই। কিন্তু কোন ভাষায় সর্ব্বনাম. ক্রিয়া-পদ, প্রত্যয়, যোজক (Conjunction) প্রভৃতির পরিবর্ত্তন করিয়া তত্তৎ স্থলে অন্য ভাষার শব্দ প্রয়োগ করিলে তাহা একেবারে অন্য ভাষা হইয়া পড়ে। উপরে যে দুইটী বাক্য উদাহরণ স্বরূপে দেওয়া হইয়াছে তাহার বাঙ্গলা শব্দগুলির পরিবর্ত্তে অন্য কোন ভাষার শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে না। এইগুলি প্রধানত সর্ব্বনাম ও ক্রিয়াপদ! ইহাদিগকে লইয়াই ব্যাকরণ এবং ইহারাই ভাষার অস্থি, মজ্জা, কঙ্কাল ও শরীর। এইগুলির প্রচলিত অবয়ব সাহিত্যে প্রযুক্ত হইবে অথবা সাধুভাষার অবয়ব সাহিত্যে প্রচলিত হইবে ইহাই আমাদের আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত। এই উভয় শ্রেণীর শব্দগুলিরই বঙ্গদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ। সর্ব্বনামগুলির যে সকল শব্দ কলিকাতায় এবং পশ্চিম বঙ্গে প্রচলিত। আছে তাহার পাঁচ সাতটী ব্যতীত আর সকলগুলিই সাধু ভাষায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুতরাং তাহা লইয়া কোন বিবাদ নাই। যত বিবাদ তাহা ক্রিয়াপদ লইয়া। সাধু ভাষায় "খাইলাম" লিখিত হয়। কিন্তু বঙ্গদেশের কোন স্থানের লোকেই কথা কহিবার সময়ে 'খাইলাম" বলে না। কোন স্থানে খেলুম খেলাম, কোন কোন জেলায় খালাম, কোন কোন জেলায় খালু বলে। সাধু ভাষায় খাইতেছি, কোথাও খাচ্চি, কোথাও খেতেছি, কোথাও খাতেছি, কোথাও খাতে আছি, কোথাও খাই আছো। এইরূপে প্রত্যেক ক্রিয়াপদের নানারূপ প্রাদেশিক আকার আছে। অথচ সাধু ভাষার আকার কোন স্থানেই প্রচলিত কথায় নাই। একদল সাহিত্যিক বলেন যে যাহা কোন স্থানেই প্রচলিত নাই তাহার পরিবর্ত্তে প্রচলিত কোন একটা ক্রিয়াপদই সাধু ভাষায় গৃহীত হওয়া উচিত। ইহা সুযুক্তি বলিয়াই বোধ হয়। কিন্তু ইহার বিরুদ্ধে আপত্তি শুনা গিয়াছে। এক স্থানের প্রাদেশিক ক্রিয়াপদ সাহিত্যিক ভাষায় গ্রহণ করিবার প্রস্তাব হইলে অন্য প্রদেশের লোকে অবশ্যই বলিবেন "আমাদের দেশের ক্রিয়াপদ গৃহীত হইবে না কেন ?" তাঁহাদের এ আপত্তি অসঙ্গত নহে। কেহ বলেন যে কলিকাতার প্রাদেশিক ক্রিয়াপদই সাহিত্যে গ্রহণ করা উচিত যেহেতু কলিকাতা আমাদের রাজধানী। কিন্তু রাজধানী হইলেই যে তথাকার ভাষা পূর্ব্ব হইতেই উৎকৃষ্ট হইয়া আছে, তাহা মানিতে পারা যায় না। রাজধানীতে নানা স্থান হইতে পণ্ডিতেরা আসিয়া বহুদিন বাস করিলে একটা আইডিয়াল ভাষা পড়িয়া উঠে। কলি-কাতায়ও কালে তাহাই হইবে। কিন্তু এখনও হয় নাই। আর একটা কথা এই যে রাজধানীত এখন আমাদের দুইটা—একটা কলিকাতা আর একটা ঢাকা। তাহা হইলে কি আমাদের দুইটা সাহিত্যিক ভাষা হওয়া উচিত ? দুইটী সাহিত্যিক ভাষা হইলে আবার নূতন প্রকারে বঙ্গ বিভাগ হইবে। অথবা, মধ্যে মধ্যে যেরূপ জনরব শুনা যায়, যদি সত্য সত্য ঢাকাই ভবিষ্যতে বঙ্গ-দেশের একমাত্র রাজধানী হয়, তাহা হইলে কি ঢাকার প্রাদেশিক ভাষাই সাহিত্যিক ভাষা হইবে ?

তৃতীয় আপত্তি এই যে কলিকাতার প্রাদেশিক ভাষা অন্য প্রদেশের লোকের পক্ষে আয়ত্ত করা অসম্ভব। কোন কোন ক্রিয়াপদের অর্থ পূর্ব্ববঙ্গে এক, কলিকাতায় আর। যেমন "করছি" শব্দের অর্থ কলিকাতায় "করি-তেছি" কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে "করিয়াছি।' সুতরাং কলিকাতার প্রাদেশিক ভাষা সাহিত্যে প্রচলিত হইলে কলিকাতা-বাসী ভিন্ন আর সকলকেই তাহা আয়ত্ত করিবার জন্য আয়াস করিতে হইবে। কিন্তু যে সাধু ভাষা বহুকাল হইতে সাহিত্যিক ভাষারূপে প্রচলিত আছে তাহার জন্য সকলকেই সমান চেষ্টা করিতে হয়।

দুইএকশত বৎসর একই স্থানে সকল প্রদেশ হইতে

বহুসংখ্যক পণ্ডিত ও প্রাকৃত জনের সমাগম ও বাস হইলে সেই স্থানে একটা আইডিয়াল ভাষা প্রস্তুত হইয়া উঠে। কলিকাতা বা ঢাকায়ও হয়ত সেইরূপ হইবে। কিন্তু আমাদিগের সে অপেক্ষায় থাকিবার প্রয়োজন নাই। আমার বিবেচনায় আমাদের যে সাধুভাষা আছে তাহাই আমাদের আইডিয়াল ভাষা। আমি পুনঃপুন আইডিয়াল শব্দটা ব্যবহার করিতেছি, তাহার কারণ এই যে আইডিয়াল শব্দের বাঙ্গলা প্রতিশব্দ আমি অবগত নহি। বাঙ্গলায় প্রায়ই দেখিতে পাই যে আইডিয়াল স্থলে আদর্শ শব্দ প্রযুক্ত হয়। কিন্তু "আদর্শ" আইডিয়ালের প্রতিশব্দ বলিয়া বোধ হয় না। যাহা দেখিয়া অনুকরণ করা হয় তাহাই আদর্শ। ইহার ইংরেজী প্রতিশব্দ model. আইডিয়াল শব্দের অর্থ মনঃকল্পিতসর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন। ইহা গ্রীক আইডিয়া বা ইডিয়া শব্দ হইতে গৃহীত হইয়াছে। প্লেটো এবং শোপেনহর বলেন যে পদার্থমাত্রই প্রকৃত বস্তুর ছায়াস্বরূপ—প্রকৃতি যেন সমস্ত পদার্থকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া সৃষ্টি করিবার জন্য কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিল কিন্তু কোন পদার্থকেই সিদ্ধিতে বা সম্পূর্ণতায় পঁহুছাইতে পারে নাই। প্রত্যেক বস্তুরই একটা প্রাণ বা আত্মা (Vital principle) আছে তাহা তত্ত্বদর্শীগণই উপলব্ধি করিতে পারেন। এই প্রাণই আইডিয়া। একজন তত্ত্বদর্শী শিল্পী একজন সাধারণ লোকের প্রতিকৃতি এমন ভাবে অঙ্কিত করিতে পারেন যে সেই প্রতিকৃতি দেখিলেই সেই লোকটী বলিয়া চিনিতে পারা যায় অথচ সেই লোকটীতে যে সকল সৌন্দর্য্য মোটেই ছিল না প্রতিকৃতিতে সেই সমস্ত সৌন্দর্য্য আছে। এই প্রতিকৃতিই সেই লোকটীর আইডিয়াল মূর্ত্তি। বাঙ্গলা ভাষায় যতরূপ উপবিভাগ আছে সকলগুলি দেখিয়া ও পরীক্ষা করিয়াই যেন আমাদের জাতীয় প্রতিভা আমাদের সাধুভাষা রূপ আইডিয়াল ভাষা প্রস্তুত করিয়াছে। প্লেটো বলেন স্বর্গে একটা ত্রিভুজ আছে যাহা সমবাহুও নহে, সমদ্বিবাহুও নহে, অসমবাহুও নহে, যাহা সমকোণও নহে, অসমকোণও নহে। আমাদের সাধুভাষাও সেইরূপ—বাঁকুড়া, বীরভূম, বর্দ্ধমান মেদিনীপুরেরও নহে, কলিকাতা, হুগলি, বারাসতেরও নহে, চট্টগ্রাম, নোয়াখালিরও নহে, নদীয়া, খুলনা, যশোহর, রাজশাহী, মালদহেরও নহে। যে জেলাগুলির নাম করিলাম সেইগুলিতে এবং বঙ্গের অন্যান্য জেলায় পৃথক পৃথক প্রাদেশিক ভাষা। এই সমস্ত প্রাদেশিক ভাষা এতই বিভিন্ন যে কলিকাতার লোক কুচবিহার রঙ্গপুর, ঢাকা, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানের লোকের একটা কথাও বুঝিতে পারে না। অথচ প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষা হইতে সাধুভাষার বিভিন্নতা অতি অল্প। সুতরাং সমস্ত বঙ্গে কোন এক ভাষা প্রচলন করিতে হইলে সাধুভাষারই প্রচলন হওয়া উচিত। যে দেশে যত প্রাদেশিক ভাষা বা উপভাষা প্রচলিত সে দেশে সেই অনুপাতে একতার অভাব। সুতরাং এই অভাব দূরীকরণ জন্যও দেশ মধ্যে যতদূর সম্ভব এক ভাষা প্রচলিত করিতে চেষ্টা করা উচিত। এই চেষ্টার ফলে প্রাদেশিক উপভাষাগুলি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইবে। উপভাষার উচ্ছেদ করা সুশিক্ষার একটা উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মার্জ্জিত ভাষাই সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে পূত ও বিভূষিত করে। আমাদের সাধুভাষাই আমাদের মার্জ্জিত ভাষা। সৌন্দর্য্যে, লালিত্যে, গাম্ভীর্য্যে, এবং সুগমতায় বঙ্গের কোন প্রাদেশিক ভাষাই সাধু ভাষার সমকক্ষ নহে।

তবে কেহ কেহ বলিতে পারেন যে "সাধুভাষাটা যখন কোন প্রদেশেরই প্রচলিত ভাষা নহে তখন উহা একটা অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম বস্তু। কৃত্রিম বা অস্বাভাবিক কিছুই কল্যাণদায়ক ও স্থায়ী হয় না।" এই কথাটা হঠাৎ শুনিতে বড়ই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যাইবে যে অভিজ্ঞতা উহা সমর্থন করে না। এক দিক দিয়া দেখিলে জগতে কিছুই অস্বাভাবিক নাই। আমরা স্বভাব হইতেই জন্মলাভ করিয়াছি, স্বভাবই আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছে। সুতরাং স্বভাব প্রদত্ত বুদ্ধি দ্বারা আমরা যাহা কিছু করি তাহাও স্বাভাবিক। কিন্তু সাধারণতঃ মানুষের বুদ্ধিদ্বারা যাহা করা হয় তাহাকেই অস্বাভাবিক বা কৃত্রিম বলে। বাবুই এবং অন্যান্য পক্ষী কুলায় নির্ম্মাণ করে; বীবর, শূকর, মধুমক্ষিকা প্রভৃতিও কত কৌশলে ভিন্ন ভিন্নরূপ আবাস প্রস্তুত করে; কিন্তু সেই সকল আবাস কে কেহ

সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ। পূজা আসিয়াছে, তিন ভাই নিজ নিজ স্ত্রী পুত্র কন্যাদের জন্য নিজ নিজ অবস্থানুসারে কাপড় জামা কিনিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বৃদ্ধা জননী কাহারও ভাগে পড়েন নাই বলিয়া তাঁহার ভাগ্যে একখানাও নূতন বস্ত্র জুটিল না। অমল ও বিমল তাঁহাকে নূতন কাপড় দিবেন কেন—তিনি যে কমলকে বেশী ভালবাসেন। কমল মনে করিলেন যদি তিনি মাকে নূতন কাপড় কিনিয়া দেন তবে অন্য দুই ভাই মনে করিবে তিনি মাকে ঘুস দিতেছেন। আবার তাঁহার স্ত্রী সুরমাও এখানে অপব্যয়ের পক্ষপাতিনী নহেন। আজ পূজার ষষ্ঠী। ছোট ভাই বিমলের মেয়ে সরলা সিল্কের জ্যাকেট্ পরিয়া বেড়াইতেছে; বড় ভাই অমলের ছোট মেয়ে তারীর গায়ে একটা সাধারণ সাদা জামা। সে সরলার সিল্কের জ্যাকেট্ দেখিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে মায়ের আঁচল ধরিল। তাহার মা অমনি তাহার পৃষ্ঠে এক চপটাঘাত করিলেন। সে গিয়া তাহার ঠাকুরমার কাছে নালিশ করিল, তিনি তখন ছোট বৌ চপলার আক্কেলের নিন্দা করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ কেন তিনি বাটীর অন্য ছেলে মেয়েদের সম্মুখে নিজ কন্যাকে সিল্কের জামা পরাইয়া দিলেন। ছোট বৌও ছাড়িবার পাত্রী নহেন—বিশেষতঃ তিনি দারগার গৃহিণী, আর তাঁহার গায়ে সোণার গহনা ধরে না। এইরূপে পূজার শুভ ষষ্ঠীর দিন বাড়ীতে এক মহা কুরুক্ষেত্র বাধিয়া গেল। তাহার ফলে সে দিন আর উনানে হাঁড়ি চড়িল না। সকলেই নিজ নিজ পয়সায় বাজার হইতে খাবার আনাইয়া খাইলেন। কেবল জুটিল না সেই বৃদ্ধা মায়ের কপালে কিছু—কারণ কেহই রাগ করিয়া তাঁহাকে খাইতে বলিল না। তিনিও অভিমান করিয়া কিছু খাইলেন না।

বলা বাহুল্য এই সংসার হইতে লক্ষ্মী অনেক দিন হইল অন্তর্হিত হইয়াছেন। এই একান্নবর্ত্তী পরিবার যত শীঘ্র ভাঙ্গিয়া যায় ততই মঙ্গল। যেখানে হৃদয়ের মিল নাই, সেখানে একটা লোক দেখান বাহিরের মিল রাখিয়া কোন ফল নাই। লাভের মধ্যে কেবল দ্বন্দ্ব, কলহ ও ঘোরতর অশান্তি।

পাঠক বর্গ এখন বিবেচনা করুন, আমাদের বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে এই তিনটী চিত্রের কোন্‌টী অধিক? আমি যত দূর জানি এই তৃতীয় চিত্রই আমাদের দুর্ভাগ্য বশতঃ অধিক হইয়া পড়িয়াছে—হয়ত শত করা ৭০টী; ২য় চিত্র শত করা ২০টী এবং প্রথম চিত্র শতের মধ্যে হয়ত পাঁচটী মিলিবে কিনা সন্দেহ। পল্লীগ্রামে হয়ত কিছু বেশী আছে. সহরে অনেক কম। সুতরাং যাহাকে প্রকৃত একান্নবর্ত্তী পরিবার বলা যাইতে পারে তাহার সংখ্যা নিতান্তই কম হইয়াছে; এবং যে দুই চারিটী আছে তাহাও ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে।

কিন্তু ইহা দ্বারা কি প্রমাণ হয়? ইহাতে বুঝা যায়, যে সকল মনুষ্যোচিত গুণ থাকাতে আমরা ভাই ভাই এক ঠাঁই থাকিতে পারি—যেমন স্নেহ, প্রীতি. সংযম, সহিষ্ণুতা. দয়া. দাক্ষিণ্য, ত্যাগ, তিতিক্ষা. যে সকল গুণ থাকিলে মানুষ মানুষ বলিয়া গণ্য এবং পশু হইতে বিভিন্ন হয় আমরা সেই সকল গুণ ক্রমেই হারাইতে বসিয়াছি। আমরা ইংরেজীতে এম. এ, বি এল্‌ই পাশ করি, বা সংস্কৃতে বেদান্ততীর্থই হই. আমাদের চরিত্র গঠিত হইতেছে না। আমরা স্বদেশ প্রীতি জাগাইতে বসিয়াছি অথচ আমাদের মধ্যে স্বজন প্রীতি দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। ইহা কি আমাদের একান্ত ভণ্ডামি নহে?

সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীনেশ চন্দ্র সেন সংপ্রতি "গৃহশ্রী" নামক একখানি পুস্তক বাহির করিয়াছেন। তাহাতে তিনি আমাদের একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। আমি সকলকে তাঁহার সেই পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তিনি বলেন এই একান্নবর্ত্তি পরিবারের প্রথম দুইটা দিক্ আছে—একটা আর্থিক অন্যটী সাত্বিক বা পারমার্থিক। তিনি লিখিয়াছেন:—

"আত্মীয় স্বজন লইয়া আমাদের ঘর করনা, তাহাদের কেহ বা অকর্ম্মা, কোন কাজই করে না, তাস খেলিয়া বাঁশী বাজাইয়া বেড়ায়; অনাথা দূর আত্মীয়া বিধবা হয়ত তাহার বিবাহযোগ্যা কন্যা লইয়া আপাততঃ গলগ্রহের মত হইয়া আছে; তিনি জপের মালায় অঙ্গুলি

করিয়া যে পুস্তক প্রণয়ন করিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি হইয়াছিল।

গলদেশে কঠোর লৌহশৃঙ্খল এবং মৃত্যুর উগ্রমূর্ত্তি সুস্পষ্ট সম্মুখে লইয়া প্রথম চার্লস তৎপুত্রের উদ্দেশে রাজ-প্রতিমা নামক গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছিলেন। রাজার বিরুদ্ধ পক্ষীয়েরা উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিবার খ্যাতি গডেনকে অর্পন করেন; বস্তুতঃ গডেনের পক্ষে অপরের অহেতুক দত্ত অপ্রাপ্য খ্যাতিলাভ করায় বিশেষ কোন আপত্তি উত্থাপন করিবার গরজ না থাকিলেও তাঁহার বিদ্যাবুদ্ধির দৌড় পুস্তকখানা প্রস্তুত করিবার একেবারেই উপযুক্ত ছিল না।

রাজ্ঞী এলিজাবেথ তদীয় ভগ্নি মেরীকর্ত্তৃক আবদ্ধ থাকিবার অবস্থায় কতিপয় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়; কিন্তু তাহার অস্তিত্ব এখন খুঁজিয়া পাওয়া দুষ্কর। কথিত আছে রাণী মেরীকে এলিজাবেথ যখন আটক করিয়া রাখিয়াছিলেন তখন তাহারও শুষ্ক হৃদয় হইতে কবিতার উৎস উছলিয়া উঠিয়াছিল।

সার ওয়াল্টার র‍্যালের বিখ্যাত পৃথিবীর ইতিহাস তদীয় একাদশ বর্ষ ব্যাপী কঠোর কারাদণ্ডের সুফল। উক্ত অসম্পূর্ণ পুস্তক খানা দেখিলে এই দুঃখ হয় যে কারাবাসে অবস্থান কালে লেখকের হৃদয়ে এরূপ এক খানা পুস্তক লেখিবার উপযুক্ত যে মহদ্ভাব সমূহ উত্থিত হইয়া তাঁহার লেখনীকে বাঙ্ময়ী শক্তি দান করিয়া ধন্য করিয়াছিল তদীয় উত্তর জীবনে তাহার মধ্যে সে শক্তির সম্পূর্ণ অভাব ঘটিয়াছিল।

র‍্যালের সম্বন্ধে হিউম বলেন—"সকলেই তাঁহার প্রতিভার প্রখরতা দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি নৌ-বিদ্যা এবং সমর বিদ্যার বীর্য্যদ্যোতক শিক্ষায় শিক্ষিত হইয়াও প্রবৃত্তির আবেগপূর্ণ তরঙ্গধারার মধ্য হইতে শান্তস্নিগ্ধ নিবৃত্তির উৎস ছুটাইয়া সুপণ্ডিতদিগকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন। যে অবিচল ধৃতি এবং অমানুষী মানসিক শক্তি তাঁহাকে এমন বয়সে এবং ঈদৃশ দুরবস্থার পেষণের মধ্যেও পৃথিবীর ইতিহাস প্রণয়নরূপ মহৎব্যাপারে হস্ত-ক্ষেপ করিতে প্ররোচিত করিয়াছিল তাহার প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না। তবে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত তাহাকে এ বিষয়ে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা এক্ষণে সকলেরই লক্ষ্যের বহির্ভূত হইয়া পড়িয়াছে।"

ফরাসী দেশের জীর্ণ কারাপ্রাকারের বেষ্টনীর মধ্যে থাকিয়া ভলটেয়ার তদীয় গ্রন্থ হেনরীয়েডের দাঁড়া ঠিক করিয়া লইয়াছিলেন; উক্ত গ্রন্থের অধিকাংশই তৎকর্ত্তৃক বন্দী অবস্থায় রচিত হইয়াছিল।

এতদ্দেশে গীতার স্বরূপ গৃহে গৃহে আদর, ইংরেজ ভাষা ভাষিত দেশে 'বুনিয়ানের তীর্থযাত্রীর অগ্রসর' নামক গ্রন্থের সেইরূপ সর্ব্বত্র সমাদর। উক্ত পুস্তকখানিও কয়েদীর হাড় পিষুণীর ফল।

হাওয়েলের পারিবারিক পত্রাবলীর অধিকাংশ দেনার দাবীতে কয়েদখানা ভোগের সময় লিখিত। তাঁহার সক্ষম, ও সরস লেখনী হইতে যাহা প্রসূত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ সারবান্ এবং প্রীতিপদ।

পুরোহিতেরা প্রত্যেক ব্যক্তির সম্পত্তির দশমাংশের অধিকারী ইহা বিধি সঙ্গত এবং রাজাভিজাত্য সর্ব্বত্র সর্ব্বজনমান্য এই বিশ্বাসদ্বয়ের বিরুদ্ধে মস্তক উত্তোলন করিয়া পণ্ডিত সেলডেন কঠোর কারাদণ্ড হেলায় বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। এই কারাভোগকালে তিনি এডামারের ইতিহাস ও তাহার টীকা প্রণয়ন করিয়াছিলেন।

লিডিয়াট দেনার দায়ে আটকা পড়িয়া পেরিয়ান ক্রনিকেলের দিব্য নোট লিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। জনসন তাহার রচনায় বোধ হয় এই পণ্ডিতের কথাই পাড়িয়া-ছিলেন কিন্তু তাহা তদীয় জীবনীলেখক বসোয়েল এবং অপরাপরের অজ্ঞাত ছিল।

সংশয়বাদী বেলী তাহার অভিধানে যে সমস্ত যুক্তি নূতন করিয়া তাঁহার পক্ষ সমর্থনার্থে উত্থাপিত করিয়াছিলেন কার্ডিনাল পেলিগন্যাক সে সকলের বিরুদ্ধে তর্ক উপস্থিত করিবেন মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু সাধারণের কাজ কর্ম্ম তাহার সে অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার পথে বিঘ্ন হইয়া পড়িয়াছিল। ডবল নির্ব্বাসনে তিনি সে সুযোগ পাকড়াইয়াছিলেন। লুক্রেশাস নামক গ্রন্থকেও তাঁহার দরবারে লাঞ্ছিত হইবার সুফল স্বরূপ মনে করা যাইতে পারে। ফরাসী পণ্ডিত ফেরেট যৎকালে কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন তৎকালে বেলী তাহার একমাত্র সহচর

ইজ্জত বজায় থাকিবে; আমার যে জাত যায় দাদা। তোমার বাড়ীর আধা পেটেও যে আমার সম্মান। তুমি যে আমার এক মায়ের পেটের ভাই। আমার যে আর তিন ভুবনে আপনার বলতে কেউ নাই।" এক শ্বাসে করুণা অনেকগুলি কথা বলিয়া ক্লান্ত হইয়া কাঁদিয়া লুটাইয়া পড়িল। অবোধ বালক মায়ের কান্না দেখিয়া বলিল "মামার বাড়ী আসিয়া তুমি আর কাঁদিবে না বলিয়াছিলে তবে এখন কাঁদ কেন মা"? বালকের কথা শুনিয়া করুণার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। যতীশ আর কোন কথা বলিতে সাহসী হইল না। সে উঠিয়া গেল। করুণা সাহস করিয়া যতীশের মুখের দিকে চাহিতে পারিতেছিল না—পাছে যতীশের দৃষ্টির ভিতর হইতে এমন একটা কিছু ইঙ্গিত বাহির হয় যাহা তাহার কাছে কেবল মর্ম্মান্তিক নিরাশার সংবাদই বহন করিয়া আনিবে মাত্র।

(৩)

যতীশ যখন কোন কথা না বলিয়া চলিয়া গেল, তখন সত্য সত্যই করুণার প্রাণ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। সে বড় আশা করিয়া ভাইএর বাড়ীতে আসিয়াছিল। মায়ের পেটের ভাই তাহাকে পায় ঠেলিয়া ফেলিয়া দিবে ও এত শীঘ্র তাহার সহিত বুঝাপাড়া হইয়া যাইবে সে ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই, তাই তাহার চতুর্দ্দিক অন্ধকার হইয়া আসিল।

মানুষ যেখানে যেটা পাইতে প্রত্যাশা করে সেখানে তাহা না পাইলে সে মর্ম্মান্তিক যাতনা অনুভব করে। করুণা ভাইএর নিকট যথেষ্ট আশা করিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। কিন্তু এক আঘাতে তাহার সব আশা ভগ্ন হইয়া গেল। কাঁদিয়া কাটীয়া, ভাবিয়া চিন্তিয়া করুণা কূল কিনারা দেখিল না। করুণা ভাইয়ের আশ্রয় ছাড়িবে বলিয়া আসে নাই। তাই ছাড়িবে না বলিয়াই স্থির সঙ্কল্প করিয়া রহিল।

ভ্রাতৃবধূ তাচ্ছিল্যের সহিত যাহা প্রদান করিত তাহাতেই ছেলে মেয়েকে লইয়া কোন প্রকারে দিন গুজরান করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম যে দুই একখানা তরি তরকারী তাহার জন্য দেওয়া হইত এখন দিন দিন তাহাও বন্ধ হইয়া গেল। পূর্ব্বে বাজার হইতে তরি তরকারী আসলে বড় ঘরে থাকিত; সুতরাং তাহা হইতে করুণাও গ্রহণ করিতে পারিত। চাকর পরিবর্ত্তনের পর অবধি নূতন চাকরকে গৃহিণী মাছ তরকারী পৃথক করিয়া আনিবার কোন উপদেশ দেন নাই, সেও তাহা বুদ্ধি খরচ করিয়া করিত না। সুতরাং মাছ মাংসের সহিত একত্র জড়িত করিয়া আনা তরকারী বিধবা করুণা গ্রহণ করিতে পারিত না। করুণা সেজন্য দুঃখিতা নহে—কোন রকম তাহার দিন কর্ত্তন হইয়া যাউক। করুণা নিজের জন্য মোটেই ব্যস্ত নহে; তবে দুঃখিনীর ছেলে দুটী যখন সময় সময় কেবল নুন ভাতের পরিবর্ত্তে দু একটু ভাজা-সিদ্ধও মুখে দিতে জেদ করিত—তখন আর করুণার চক্ষে বাধা মানিত না, তাহার দুই গণ্ডে অশ্রুধারা বহিয়া চলিত। দীন দরিদ্রের অশ্রু ব্যতীত আর সম্বল কি? মায়ের চক্ষে অশ্রু দেখিলে বালক দ্বয়ের জেদ-আব্দার জল হইয়া যাইত; তাহারা আর কোন কথা বলিত না—কোন বাহানা তুলিত না।

(৪)

আজ অম্বুবাচী। বিধবা করুণা অগ্নিস্পর্শ করিবে না। ছেলে দুটীও সুতরাং এ পর্য্যন্ত কিছু খায় নাই—খাইবার আব্দার করিতেছে। করুণা ভাবিতেছে—বউ যদি নিতান্তই ছেলে দুটাকে ডাক না দেয়—তবে তারা আজ খাইবে কি? কি বলিয়া সে তাহাদের খাবার জন্য আজ বউকে অনুরোধ করিবে। দাদার নিকটেই বা কি করিয়া তাহা প্রকাশ করিবে?

ছেলে দুটার কথাই বসিয়া বসিয়া করুণা ভাবিতেছিল। এমন সময় বাহির বাটীর দিকে যাইতে যাইতে যতীশ ডাকিল "করুণা আজ তোমার উপবাস?"

বহুদিন পরে করুণা অপ্রত্যাশিত ভাবে দাদার সস্নেহ সম্বোধন শুনিয়া নিজকে ঠিক রাখিতে পারিল না। তাহার হৃদয়ের পুঞ্জীভূত আবেগ ও বেদনা যেন অন্য কোন পথ না পাইয়া তাহার দুই চক্ষু ঠেলিয়া সবেগে বাহির হইতে লাগিল। করুণা শব্দ করিতে পারিল না।

ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূর নিত্য তাচ্ছিল্যে সঞ্চিত বেদনারাশি হৃদয়ের পরতে পরতে যাতনার উৎস জমাইতেছিল তাহা

ফেলে তবে আমাদিগকে বাধ্য হইয়া বন্দুক চালাইতে হইবে।" এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমাদের প্রত্যেকের নিকট এক একটা ছয়নলা রিভলভার ছিল।

ঠিক ১২টার সময় আমরা চারি জনে বাহির হইলাম। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাজবাড়ীর দরজা উন্মুক্তই পাইলাম। তথায় কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। আমরা গ্রামের পথে প্রবেশ করিতে না করিতে ৩।৪টা কুকুর তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। কিন্তু মাংস ও রুটির টুকরা দিবামাত্র তাহারা নীরব হইল। আমরা অতি দ্রুত পদে অগ্রসর হইলাম। সকলেই জুতা খুলিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমাদের গমন শব্দ কেহই শুনিতে পাইল না। বিশেষ, সেই গভীর রাত্রে বোধ হয় গ্রামের সকলেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। অনুমান ৩ মিনিটের মধ্যেই আমরা গ্রাম ত্যাগ করিয়া এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

এই সময় আমরা আমাদের পশ্চাতে অনেক লোকের কোলাহল শুনিতে পাইলাম। গাইড বলিল, "আমাদের পলায়ন উহারা জানিতে পারিয়াছে এবং বোধ হইতেছে উহারা আমাদের অবলম্বিত পথও জানিতে পারিয়াছে। এখন দৌড়িতে হইবে।" আমরা তখন রীতিমত দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম। খানিকক্ষণ পরে আমরা একটা দলদল ভূমির (পাঁক পরিপূর্ণ জমি) উপর উপস্থিত হইলাম। গাইড বলিল, "ইহা পার হইবার কেবল মাত্র একটী পথ আছে। অন্য পথে যাইলেই পাঁকের মধ্যে ডুবিয়া যাইতে হইবে। কাহারও কাছে দিয়াশলাই আছে?" কাপ্তেন সাহেব বলিলেন "আছে।" গাইড বলিল, "আমাকে বাক্সটা দিন। ঠিক আমার পিছনে পিছনে সকলে আসুন। একটু এদিক ওদিক হইলেই পাঁকের মধ্যে পড়িতে হইবে।" গাইড অগ্রসর হইল, আমরা খুব সাবধানের সহিত তাহার পশ্চাৎ ২ চলিলাম। ভগবানের কৃপায় আমরা নিরাপদে ঐ ভীষণ স্থান পার হইলাম।

এই সময় গাইড আমাদিগকে দাঁড়াইতে বলিয়া ঐ দলদলের দিকে ফিরিয়া গেল। ২।৩ মিনিট পরে সে আবার ফিরিয়া আসিল, এবং আমাদিগকে সঙ্গে লইয়া দৌড়াইতে আরম্ভ করিল। ইহার পর আমরা নিরাপদে ফিরিয়া আসিলাম। যখন আমরা ফিরিয়া আসিলাম তখন গাইড বলিল "আসিবার সময় আমি ঐ দলদলে পথের এক স্থান নষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম। সেই জন্য তাহারা আর আমাদের পশ্চাৎ ২ আসিতে পারে নাই।"

পরদিবস আমরা সাহেব দুই জনের জন্য কুলি সংগ্রহ করিয়া দিয়া নিজের গন্তব্য পথে চলিয়া গেলাম। তাঁহারা অন্য দিকে প্রস্থান করিলেন। আমাদের সময় ও সুযোগ ছিল না বলিয়া ঐ বিশ্বাসঘাতক রাজার দণ্ডের কোনও বন্দোবস্ত করিতে পারিলাম না। তবে কাপ্তেন সাহেব পুনঃ ২ বলিলেন যে, তিনি মোম্বাসায় ফিরিয়া আসিয়াই রাজার শাস্তির বন্দোবস্ত করিবেন।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জঙ্গল ক্রমে ক্রমে বেশ পাতলা হইয়া আসিতেছিল। আরও ৩।৪ দিন ঐভাবেই চলিয়া বড় বড় গাছের সংশ্রব একবারে কমিয়া আসিল। তখন ছোট ছোট গাছ ও ডাল ভিন্ন আর কিছু দেখিতে পাইলাম না। আগে মাঝে ২ এক আধটা গ্রাম নজরে আসিত। এ প্রদেশে কিন্তু জনমানব দেখিলাম না। একটা কারণ বেশ স্পষ্টই দেখিলাম। কোথাও এক বিন্দু জল দেখিনাম না। গাইড আমাদিগকে পূর্ব্ব হইতে সাবধান করিয়াছিল বলিয়া আমরা সঙ্গে জল লইয়া আসিয়াছিলাম তাহা না হইলে ঐ পথে আমাদের যাওয়া বোধ হয় সম্ভব হইত না।

এ সব দেশে বৃষ্টি খুব কম হয়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদী ও বিল আছে, কিন্তু বৃষ্টির অভাবে উহা প্রায়ই শুখাইয়া যায়। এই প্রদেশ, এদেশে 'তারু' প্রদেশ নামে প্রসিদ্ধ। এ স্থানে আমরা জিরাফ ভিন্ন আর কোনও জন্তু দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। এই জন্তু উচ্চতায় সাধারণতঃ ১৫ হইতে ২০ ফুট পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। শুধু গলাটাই প্রায় ৭।৮ ফুট হয়। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি, বড় বড় গাছের উপরের কচি ২ পাতা ইহারা অনায়াসে আহার করিতেছে। তবে যাহারা মনে করেন বা বলেন যে, ইহারা বড় বড় তালগাছের পাতা খাইতে পারে, তাহা-

গ্রন্থ-সমালোচনা।

আধুনিক সভ্যতা—শ্রীযুক্ত শিবেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত। গ্রন্থকার বর্ত্তমান কালানুযায়ী সমাজের কিরূপ আচার ব্যবহার ও পরিচ্ছদ হওয়া কর্ত্তব্য সেই সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার বক্তব্য বিষয়—শিষ্টতা ও ভদ্রতা; অভিভাষণ ও সম্ভাষণাদি; পরিচয়; বেশ ভূষা; অঙ্গরাগ ও অঙ্গসজ্জা ভদ্রতার কতিপয় সাধারণ বিধি মনের উচ্চতা সাধন প্রণালী; মহিলাগণের পরিচ্ছদ; মহিলাগণ সম্বন্ধে বিশেষ বিধি; অঙ্গ বিন্যাস; সময় নিষ্ঠা; অলসতা; নিমন্ত্রণ; চিঠি পত্র; সভা সমিতি ইত্যাদি। গ্রন্থকার তাঁহার প্রতিপাদ্য বিষয়গুলি দ্বারা নানা জাতি ও শ্রেণীর সংমিশ্রণ জনিত বর্ত্তমান খিচুড়ি-সভ্যতার সংস্কার সাধন দ্বারা ভারতীয় সভ্যতাকে আদর্শ রাখিয়া তাহার সহিত পাশ্চত্য সভ্যতার সামঞ্জস্য বিধান করিয়া—এক নূতন সভ্যতার সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য উচ্চ এবং যদিও তাঁহার নির্দ্দেশিত আচার ব্যবহারের প্রচলন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে বটে কিন্তু সমাজও দেশকাল পাত্র ভেদে এইরূপ আচার ব্যবহার সম্পূর্ণ সমাজ সঙ্গত হইতে অনেক সময় সাপেক্ষ হইবে বলিয়াই মনে হয়। যাহা হউক তবুও বর্ত্তমান বিশৃঙ্খল আচার ব্যবহারের একটা সংস্কার আবশ্যক। ভারতীয় নর নারী ভারতীয় সভ্যতার আদর্শে শিক্ষিত হউক ইহা প্রাচীন মতাবলম্বী দিগের মত হইলেও অবস্থার বিপর্য্যয় ও নানা কারণ বশতঃ সমাজের যে গতি দাঁড়াইয়াছে তাহা হইতে উহাকে পুনরায় দুই সহস্র বৎসরের পুরাতন খাতে নিয়া ফেলা একবারেই সম্ভবপর নয়। বিশেষতঃ প্রদেশ ভেদে নানা আচার বিশিষ্ট ভারত বাসীদিগকে লইয়া পৃথিবীর অপরাপর জাতির সহিত প্রতিযোগীতা করিতে সক্ষম এমন একটা 'নেশন' গড়িতে হইলে পাশ্চত্য সভ্যতার সহিত ভারতের সকল প্রদেশের রীতিনীতি আচার ব্যবহারের একটা সামঞ্জস্য বিধান করা আবশ্যক। গ্রন্থকার এই পুস্তকে সেই চেষ্টাই করিয়াছেন। পরন্তু আধুনিক সভ্যতা প্রয়াসী অনেক শিক্ষিত লোকও সামাজিক রীতিনীতি বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বশতঃ প্রকৃত চাল চালনের সম্যক অনুশীলন করিতে না পারিয়া অনেক সময়ে অপদস্থ হইয়া পড়েন। এই সকল নিবারণ কল্পেও গ্রন্থকার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। এই পুস্তক খানি পাঠে যুবকদিগের আদব-কায়দার অনেক সংশোধন ও নূতন শিক্ষা হইবে। সুতরাং ইহা যে বালক ও যুবকগণের শিক্ষাও আদরের সামগ্রী হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। স্থানে স্থানে যৎসামান্য ভুল ভ্রান্তি থাকিলেও গ্রন্থের ভাবও ভাষা ভাল হইয়াছে। মূল্য আট আনা; কলিকাতা ষ্টুডেণ্টস্ লাইব্রেরীও অন্যান্য পুস্তকালয়ে পাওয়া যায়।

সাহিত্য সংবাদ।

গো-ধন প্রণেতা শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নূতন সামাজিক উপন্যাস "উমাও রমা" প্রকাশিত হইয়াছে।

পণ্ডিত শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ মহাশয় "বঙ্গীয় অধ্যাপক জীবনী" ১ম খণ্ড লিখা শেষ করিয়া তাহা মুদ্রণ জন্য রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের হস্তে প্রদান করিয়াছেন। এখন তিনি উহার দ্বিতীয় খণ্ড লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

শ্রীমান প্রফুল্ল কৃষ্ণ ঘোষ তাঁহার "চমচম" বাহির করিয়াছেন।

ডিরেক্টার বাহাদুরের অনুমোদিত
সুবৃহৎ
শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত।
বঙ্গানুবাদ ও আস্বাদন সহ
শ্রীনগেন্দ্র কুমার রায় কর্তৃক প্রকাশিত।
শ্রীপাঠ্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের একমাত্র সংস্করণ।
অদ্যাবধি এরূপ সুন্দর সংস্করণ প্রকাশিত হয় নাই।
মূল্য বাঁধা ৬৲ টাকা, কাগজের মলাট ৫৲ টাকা।

Printed by Satish Chandra Rai at the Jagat Art Press. Dacca. Published by Kedarnath Majumdar, Mymensingh.

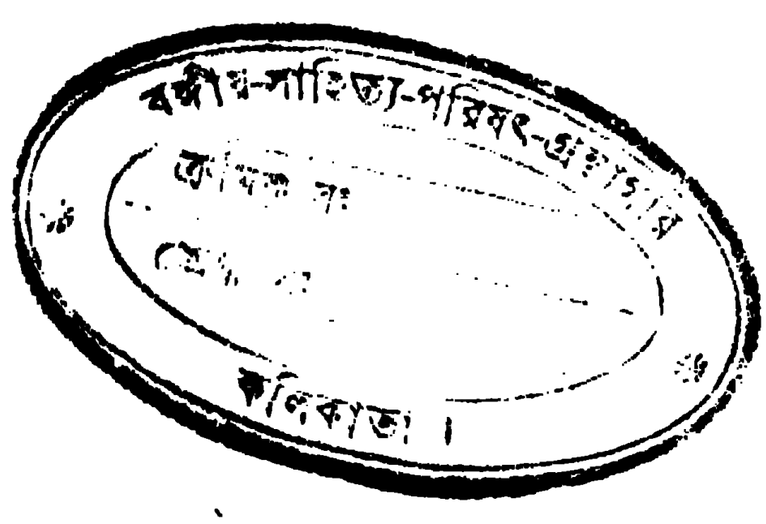
বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
কলিকাতা।

রুগ্ন, বিকলাঙ্গ ব্যক্তিকে সমাজ অনুকম্পা-পরবশ হইয়া নানা উপায়ে রক্ষা করিতে চেষ্টা না করিয়া যদি তাহার বিনাশের পথ সুগম করিয়া দেয় তাহা হইলেই সমাজের পক্ষে মঙ্গল—তখন পৃথিবী অত্যন্ত নিষ্ঠুর মনে করিয়া এ উক্তি শ্রবণ করিতে চায় নাই। কিন্তু আজ অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে—নিষ্ঠুরতাকেই গুণ বলিয়া জার্ম্মেণ দার্শনিক নীট্‌চে ইহারই পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন। সুপজনন বিজ্ঞানের মুখেও আজ এই কথাই শুনিতে পাই। কেহ বা প্রিয় কেহ বা অপ্রিয়ভাবে এই কথার আবৃত্তি করিতেছেন। সামাজিক জীবনে সব দিক রক্ষা করিয়া কি ভাবে ইহাকে ফলপ্রদ করিয়া লওয়া যায়, সর্ব্বসম্মতি ক্রমে তাহা এখনও স্থিরীকৃত হয় নাই। কিন্তু পিতার পাপে পুত্র পাপী হয়, পিতার রোগ বা কুপ্রবৃত্তি পুত্রে সঞ্চারিত হয়,—নানা ভাবে সমর্থিত দর্শন বিজ্ঞানের এই সত্যকে সাহিত্যও আজ আপনার বিষয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। ইবসেন্ 'প্রেতাত্মায়' ইহারই অবতারণা করিয়াছেন।

'Pillars of Society' বা 'সমাজের আশ্রয়স্তম্ভ' নামক ইব্‌সেনের অন্যতম নাটকের বিষয়ও সামাজিক। ইহুদীরা যেমন নিজেদের সম্বৎসরের পাপের বোঝা একটী ছাগনন্দনের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়া তাহাকে বনে ছাড়িয়া দিয়া নিজেদিগকে পাপমুক্ত মনে করিত, সমাজে সেইরূপ ধনী নিজের পাপের বোঝা অন্যের স্কন্ধে আরোপ করিয়া—নিজের অন্তরের কলঙ্ক গোপন করিয়া, কিরূপে সমাজের শ্রদ্ধা ও সম্মান ভোগ করিয়া থাকেন, —কিরূপে সমাজের আশ্রয়-স্তম্ভ রূপে পূজিত হইয়া থাকেন, 'সমাজের আশ্রয়-স্তম্ভ' নামক নাটকে ইব্‌সেন্ তাহা দেখাইয়াছেন। সমাজের এই আত্মপ্রবঞ্চনা—এই মিথ্যা, এই ভাণ, এই অন্তঃসারশূন্যতা দূর হউক, শুধু কবির নয়, দার্শনিকেরও তাহা চরম অভিলাষ। প্লেটো তাই দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন 'দার্শনিক যে পর্য্যন্ত রাজ্য শাসনে অভিষিক্ত না হন এবং রাজারা যে পর্য্যন্ত প্রকৃত দার্শনিক না হন, সে পর্য্যন্ত জগতের মঙ্গল নাই—আদর্শ রাষ্ট্রের সৃষ্টি সে পর্য্যন্ত হইতে পারে না'। ধর্ম্মে, নীতিতে, সুখে শান্তিতে সুন্দর সমাজের প্রতিষ্ঠার আশা শুধু কল্পনায় নয়, নিষ্ঠুর বাস্তবের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া কবি আজ প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন।

ইংলণ্ডে বার্ণার্ড শ' শিষ্ট রুচিতে যতই আঘাত করুন না কেন, সমাজের বহুবিধ কলঙ্ক অপনীত হউক, মানব সমাজ তাহার নামের উপযুক্ত হউক, এই উদ্দেশ্য তাঁহার স্পষ্ট। অন্ত্য শ্রেণীদের দুঃখ দৈন্য, পতিতা রমণীদের দুর্দ্দশা—ধর্ম্মের নামে অধর্ম্ম নীতির নামে অনীতি, মিথ্যা প্রবঞ্চনা সমাজ হইতে দূর হউক, ইহা বার্ণার্ড শ ইচ্ছা করেন। এ সকল যে সমাজে রহিয়াছে, অতি নির্ম্মম ভাবে তাহা তিনি আমাদিগকে দেখাইতে চান। শিষ্টেরা দূরে থাকিয়া 'প্রক্ষালনাদ্ধি পঙ্কস্য দূরাদস্পর্শনং বরং' মনে করেন; কিন্তু তাঁরা ভুলিয়া যান, সমাজে যে পঙ্ক, যে আবিলতা সঞ্চিত হইতেছে—বিস্তৃত হইয়া ক্রমে তাহা শিষ্টদের স্থানও কলুষিত করিয়া দিবে। কণ্টকের উন্মূলন না করিলে সমস্ত দেহই অসুস্থ হয়; পায়ে রহিয়াছে বলিয়া ইহাকে উপেক্ষা করা চলে না। সমাজের অন্ত্য শ্রেণীতে পাপ রহিয়াছে; শিষ্টেরা চক্ষু বুজিয়া যে নিজদিগকে নিরাপদ্ মনে করেন তাহা ঠিক নহে। আর শিষ্টেরা কি বাস্তবিকই দূরে—বাস্তবিকই কি তাঁরা পাপদ্বারা স্পৃষ্ট নন? নানা রকমে তথাকথিত শিষ্টেরা তথাকথিত পাপীদের সহিত সংসৃষ্ট। সমাজের দেহে রক্তস্রোতের সহিত রোগের, পাপের—মৃত্যুর স্রোত মিশিয়া রহিয়াছে; নানা প্রকারের অধর্ম্ম, অনীতি ভণ্ডামিকে সমাজ প্রশ্রয় দিতেছে; ধনপতি কুবেরের একচ্ছত্র রাজত্ব স্বীকার করিয়া নানা রকমে সমাজ পাপকে প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছে। মৃত্যুর বীজের সহিত কোলাকুলি করিয়া কতকাল সমাজ বাঁচিয়া থাকিবে? একদিন এই বীজ অঙ্কুরিত হইবেই; সমাজ যদি আপনার পদ্ধতি পরিবর্ত্তিত না করে, মৃত্যু তাহার অনিবার্য্য। চিকিৎসা-বিধানের কথা, মিউনিসিপ্যালিটীর কথা, বিবাহের কথা নানাবিধ কথার অবতারণা করিয়া তাঁহার নাট্যাবলীতে ও অন্যত্র নানাভাবে বার্ণার্ড শ এই মত ব্যক্ত করিয়াছেন।

সুতরাং দেখিতে পাই, ধর্ম্মনীতির কথা, সমাজের কথা নানাভাবে আজ ইউরোপের সাহিত্যে ফুটিয়া উঠিতেছে। শুধু ইউরোপেই বা কেন, সমস্ত পৃথিবী

ও রতি এক তাঁবুতে থাকিতাম। রাত্রি তখন প্রায় ১২টা। আমরা তাড়াতাড়ি শয্যা ত্যাগ করিয়া অবিলম্বে সাহেবদের তাঁবুর সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। দেখিলাম, আমাদের সিপাহীরা দুইজন ঐদেশীয় লোকের সহিত ধস্তাধস্তি করিতেছে।

শীঘ্রই তাহারা বন্দী হইল। দেখা গেল যে প্রত্যেকে একখানা করিয়া বড় ছোরা হাতে লইয়া আসিয়াছিল। তাহাদের মৎলব যে ভাল ছিল না তাহা বেশ স্পষ্টই বোধ হইল। পরে উহারা স্বীকার করিল যে, তাহারা আমাদের শিবিরের পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসী। উহারা সুপো। দলপতির আদেশ অনুসারে উহারা সাহেব দুইজনকে হত্যা করিতে আসিয়াছিল। তাহাদের ইচ্ছা ছিল যে সাহেব দুই জনকে মারিয়া উহাদের মুণ্ড লইয়া যায়। তাহারা যে মধ্যে মধ্যে নরমাংস ভক্ষণ করে, তাহা তাহারা স্বীকার করিতে বিন্দুমাত্র ইতঃস্তত করিল না। মৃত দেহকে আগুনে ঝলসাইয়া উহার মধ্যে মসলা দেয়, তাহার পর উহা ছুরির সাহায্যে খণ্ড খণ্ড করিয়া খাইয়া ফেলে।

পরদিবস আমরা এক গভীর জঙ্গলে প্রবেশ করিলাম। ইহা এত গভীর যে অধিকাংশ স্থানে সূর্য্যের আলো একবারে দেখিতে পাওয়া যায় না। এক একটা গাছ এত মোটা যে, বোধ হয় ১০।১২ জন লোকও উহা আঁকড়াইয়া ধরিতে পারে না। শুনিলাম, পৃথিবীতে এমন জন্তু খুব কম আছে, যাহা এই বনের মধ্যে পাওয়া যায় না। অবশ্য এতদিন পর্য্যন্ত আমরা প্রায়ই জঙ্গলের ভিতর দিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু তাহার সহিত এই জঙ্গলের অনেক প্রভেদ। ২।৩ মাইল গভীর জঙ্গল, তাহার পর হয়ত ময়দান, তাহার পর কয়েক মাইল পর্য্যন্ত ছোট ছোট গাছের জঙ্গল, তাহার পর লোকালয় আবার জঙ্গল। এতদিন এই ভাবেই চলিতেছিল। আজ কিন্তু ব্যাপার সম্পূর্ণ অন্য প্রকার। শুনিলাম, এই জঙ্গল প্রায় ৪০০ মাইল পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার চওড়াই ৩০ হইতে ১৬০ মাইল। এই বিস্তৃত ভূভাগ এই প্রকার বড় বড় গাছে পরিপূর্ণ। এক এক স্থানে ইহা এত গভীর যে, আমাদিগকে গাছ কাটিয়া পথ প্রস্তুত করিতে হইয়াছিল। এই জঙ্গলে নানা জাতীয় সিংহ, ব্যাঘ্র ও ভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়। গণ্ডারও ইহার মধ্যে অনেক আছে। পক্ষী যে, কত প্রকারের আছে, বোধ হয় তাহার সংখ্যা নাই। এই সুবিস্তৃত গভীর জঙ্গলের মধ্যে অত্যন্ত জলাভাব বলিয়া অন্য লোক দূরের কথা এখানকার অসভ্য অধিবাসীরাও ইহার মধ্যে প্রায় প্রবেশ করে না। এখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, আমরা এই জঙ্গলের উত্তর ধার দিয়া অগ্রসর হইলাম। আমাদের গাইড আরলির পরামর্শে আমরা ইহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম না।

সন্ধ্যার কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে আমরা মাসোনগলেনি নামক এক বৃহৎ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

সুমতি।

ব্রজ গোপাল, মদে বিভোর
দিন রাত ভেদ বোঝে না,
আপন জনের, হিতের কথা
এখন আর তার রোচেনা।
বাপ মায়ে তার, হদ্দ মেনে
হতাশ হয়ে চেষ্টাতে,
বুদ্ধি করে, মনে মনে
যুক্তি করে শেষটাতে—
গোসাই প্রভু, ভক্ত প্রধান,
উপদেশে খুব জবর
আছে না হয়, তাঁরেই এবার
আসতে হেথা দেই খবর!
গোঁসাই এসে, বল্লেন ডেকে
"ওরে ব্রজ, কথা রাখ্—
মদ ছেড়ে দে, লক্ষ্মী ছাড়া
শান্ত শিষ্ট হ'য়ে থাক্।

[ব্যাবিলনীয় দেবতা 'মর্ডক' তিয়ামস ও অহিনাশ করিয়াছিলেন। (Vide Historian's History of the world Vol. I. p. 522)।

ঋগ্বেদে (৪।১৮।১২) ইন্দ্রকে 'মার্ডীক' বলা হইয়াছে। ঋগ্বেদে মুর নামে এক জাতির উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা

যাতুধানান্ মূরদেবান্ ক্রব্যাদঃ। ১০।৮৭।২]

২৬। Cenimagni—জাতির নাম — শেনিমঘী।

[ঋগ্বেদে দেখিতে পাই শ্যেন সোমলতা পৃথিবীতে আনয়ন করে। মঘবন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে মঘোনী। মঘোনী অর্থে beautiful, liberal, munificent। আমার মনে হয় ল্যাটিন magnus শব্দও মঘবন্ শব্দ তুল্যরূপ। শেনিমঘী অর্থে বৃহৎ বা দানশীল শ্যেন বুঝাইতেছে।].

২৭। Duboni—জাতির নাম—দুবোনি।

[দুব অর্থে দেব যাজন। ঋগ্বেদের ৩।৬।৪ ঋকে দুব শব্দ আছে।

চক্রির্যো বিশ্বা ভুবনাভি সাসহিচক্রির্দেবে ষাদুবঃ।

যিনি (অগ্নি) সকল ভুবনের কর্ত্তা, (ও সৃষ্টির পর তাহাতে) অনুপ্রবিষ্ট; হবি বহনকারী (তিনি) আমাদের দত্ত হবি দেবতাদিগের নিকট আনয়ন করেন।

অতএব যে জাতি দুব বা হবি প্রদান করেন তাহাদিগকে দুবোনি বলা যাইতে পারে।]

২৮। Carnavii—জাতির নাম—কর্ণভী।

২৯। Volantii ঐ বলন্তী

৩০। Catu Vellonni ঐ চতুবেল্লোনী

৩১। Coitanni—জাতির নাম—চৈতন্নী।

[চৈতন্য হইতে বিকৃত হইয়া চৈতন্নী হইয়াছে।]

৩২। Caledonian—জাতির নাম—কলিদোনী।

[কলি নামে এক ঋষির উল্লেখ বেদে দেখিতে পাওয়া যায়।]

৩৩। Somerton—স্থানের নাম—সোমেরতন্।

[বর্ত্তমান Somersetshireএর প্রাচীন নাম। সম্ভবতঃ এই স্থানে পূর্ব্বে সোমলতা জন্মাইত; সেইজন্য ইহাকে সোমপুত্র বলা হইত।]

৩৪। Lindiswaras—স্থানের নাম—লিন্দীশ্বর।

[বর্ত্তমান Lincon shireএর প্রাচীন নাম।]

৩৫। Cuiron—মদ্যের নাম—সুইরং (বা সুরা)।

[দৃতিং সুরাবতো গৃহে। ঋগ্বেদ, ১।১৯১।১০]

৩৬। Mead—এক প্রকার মদ্যের নাম—মীড্

[স বর্ধিতাবর্ধনঃ পূয়মানঃ সোমো মীঢ্বান্।

ঋগ্বেদ ৯।৯৭।৩৯

অর্থ :—(দেবতাদিগের) বর্দ্ধনকারী, (স্বয়ং) বর্দ্ধনশীল, মীঢ্ব (মধুবৎ) সোম।

সোমকে মীঢ্ব বলা হইল। Mead প্রাচীনকালে ইংলণ্ডে প্রচলিত ছিল। Welsh ভাষায় ইহাকে Medd বলা হয়।]

৩৭। Home—গৃহের নাম—হোম।

[আয়বে সহস্রনীথো অধ্বরস্য হোমনি। ঋগ্বেদ ৩।৬।১৭ আয়ুকে দানের নিমিত্ত, হে সহস্র প্রকার দানশীল (ইন্দ্র) যজ্ঞের হোমে (আগমন কর)। হোম অর্থে অগ্নিতে সোমাদি নিক্ষেপ করা। যেখানে হোম করা যায় তাহাকে হোম স্থান বলা যাইতে পারে। ইংরাজীতে Home অর্থে গৃহ। আমার মনে হয় পূর্ব্বে Home অর্থে সোম যজ্ঞের স্থান বুঝাইত। ক্রমশঃ উহা বুঝাইয়াছে।]

উপসংহারে আমার এই মাত্র বক্তব্য যে মানবজাতির প্রাচীন ইতিহাস সংকলনে আমার দ্বারা প্রদর্শিত চিহ্ন সকল যদি কোন মাত্র সাহায্য করিতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার শ্রম সার্থক মনে করিব।

বিসর্জ্জন।

"ওকি, তুমি অমন চুপটী করে বসে পড়লে যে? ডাক্তার এবেলা কি বলে গেল?"

"বল্লে খুব বেদানার রস খেতে দিয়ো ওকে। সেদিন যে বেদানাটা এনেছিলাম তাকি সব ফুরিয়ে গেছে? থাকেতো একটু রস ওকে দেও না! আহা খোকার গলা বুঝি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল!"

"একটা বেদানায় আর কদিন চলবে? ফুরিয়ে

টাকাকে টাকা জ্ঞান করে নাই, দৈন্যকেও দুঃখপূর্ব্ব মনে করে নাই। সুহাসিনীর যে দু চার খানা গহনা ছিল, সেগুলিও একে একে বাঁধা দিয়া খোকার চিকিৎসা করিতে স্বামীস্ত্রীর মনে কখনো উৎসাহের অভাব হয় নাই, বা কখনো কুণ্ঠার উদয় হয় নাই। কতদিন তারা স্বামীস্ত্রীতে এক সঙ্গে ভগবানের চরণে আকুল হইয়া সজল নেত্রে ভক্তিরুদ্ধকণ্ঠে শিশুর প্রাণ ভিক্ষা চাহিয়াছে! কিন্তু আমাদের কর্ম্মসূত্র জটিল ঘটনা জালে সমাচ্ছন্ন। অনেক সময়ই নিস্বার্থ ভালবাসাও এ জগতে প্রত্যাশিত ফলের আকাঙ্ক্ষাটী অপূর্ণ রাখিয়াই ব্যর্থ হইয়া যায়! কিন্তু চিরকরুণাময় মমতাকে জন্মান্ধ করিয়াই রাখিয়া দিয়াছেন! তাই সুহাসিনীর মনে হইল, যে সেদিন এক অশ্রুসিক্ত করুণ প্রভাতে তার হৃদয় নিলয়ের শ্যামল কুঞ্জে নীড় রচনা করিয়াছে, সে কি প্রভাতের গান না থামিতেই চরণকমলের রক্তিম বিক্ষোপে হৃদয়প্রাঙ্গন সুরভিত গুঞ্জরিত করিয়া সহসা দেশান্তরের নীলাম্বুচুম্বিত সিন্ধুকূলে সহসা উড়িয়া যাইতে পারে? যার ছন্দে সুহাসনীর হৃদয় ক্ষণিকের জন্য মৃদু হইতে মৃদুলে, ভাষা হইতে ভাবে, এমন করিয়া স্পন্দিত হইয়াছিল, সে কি সহসা এমন করিয়া বিস্মৃতির মাঝে মিথ্যা হইয়া যাইতে পারে?

নীলনক্ষত্র রঞ্জিত আকাশের দিকে তাকাইয়া সুহাসিনী ভাবিতে লাগিল ঐ যে নীলাকাশে সোণালি চাঁদের রেখা উজ্জ্বল নক্ষত্র জালে আচ্ছন্ন হইয়া বিরাজ করিতেছে, সেই যেন তার খোকা। তার খোকাই যেন চাঁদের বেশে নক্ষত্রলোক উদ্ভাসিত করিয়া আমাদের নিশীথের ছায়ালীন পৃথিবীকে জ্যোৎস্নাময় করিয়া রাখিয়াছে। আকাশে বাতাসে, জ্যোৎস্নায় গন্ধে যেন উথলিতেছে তারি খোকার হাস্যমাধুরী! আজ যেন নৈশপ্রকৃতির নীরব ছন্দের সহিত বাঁধা হইয়াছে তারি খোকার ঘুমের রাগিনীটী নিবিড় আনন্দের মাঝে তার রুগ্ন শিশু নূতন হইয়া উঠিল। গৃহের স্নেহ বেষ্টনী এক রহস্যময় মায়া যষ্টির পরশে জ্যোৎস্নাঙ্কিত দিকপ্রান্তে ব্যাপ্ত করিয়া নীলাম্বরের কিরণোজ্জ্বল স্বর্ণমেঘ খণ্ডের উপর তারি খোকা যেন অপরূপ মূর্ত্তিতে ত্রিভঙ্গ হইয়া দাঁড়াইল। আজ যেন সুহাসিনীর খোকার অর্দ্ধ শ্রুত অর্দ্ধ কল্পিত সুমধুর হাস্য-ধারায় সমুদয় অন্তরীক্ষ ভরিয়া ভাসিয়া গেল, ছড়াইয়া গেল! এই অতটুকু শিশু, এই অপরূপ শিশু আজ আপনার শিশির স্বচ্ছ একবিন্দু প্রাণের লীলায় সুহাসিনীর সমুদয় স্বপ্নলোক দীপ্ত করিয়া দিল! সুহাসিনী হাত জোড় করিয়া ভগবানকে প্রণাম করিয়া বলিল,—দয়াময়, এতদিনে সুর মিলিল, তোমাকে আমি এতদিন আমার খোকা বলিয়া চিনিতে পারি নাই!

(৩)

সুহাসিনি, তুমি একটু ওদিকে সরে যাও, শরৎ একবার খোকাকে দেখবে?

সে আবার কে?

"শরৎ আমার বন্ধু ডাক্তার। কাল যখন অত করেও এখানে ডাক্তার জোটাতে পারিনি, তখন শরতকে টেলিগ্রাফ করে দিয়েছিলাম। ভোরের ট্রেণে এসে পৌঁচিয়েছে। ও আমার কাছে ভিজিট ফিজিট কিছু নেয় না, নেবে না।"

"কাল রাতে ঐ ঘুমের অষুধটা খাওয়ার পর থেকে খোকা বেশ শান্ত হয়ে ঘুমাচ্চে। একবারটীও কাঁদে নি। শরৎ বাবুকে না হয় বাইরের ঘরে একটু বসতে বল, ও ততক্ষণ একটু ঘুমাক।"

"ঘুম না ভাঙ্গিয়েও তো শরৎ একবার খোকাকে দেখতে পারে, তাই না হয় করিনা, কাল রাত্রে সময় সময় খোকার নাড়ী মোটেই পাওয়া যাচ্ছিল না!"

শরতকে সঙ্গে লইয়া হিমাংশু যখন পুনরায় রোগীর ঘরে প্রবেশ করিল তখন ভোর হইয়াছে। ভোরের আলো দরমার বেড়ার ফাঁকে ফাঁকে হীরার মালা বসাইয়া ঘরটীর চারিদিক হইতে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। প্রভাতের মায়া রুগ্ন শিশুর ঘুমন্ত মুখখানা চুম্বন করিয়া যেন শয্যা প্রান্তে লুটাইয়া পড়িয়াছিল।

"দেখুন হিমাংশুদা—"

"কি শরত, তুমি খোকার হাত দেখে এমন চমকে উঠলে যে?"

"চমকে উঠবার কোনো কারণ হয় নি। আপনি বৌদিদিকে এখান থেকে একটু সরে যেতে বলুন না।"

ভক্ত কবি কানাই বলাই।

ময়মনসিংহের জেলার হোসেনপুরের কিঞ্চিদক্ষিণে "দগ্‌দগা" গ্রাম। এই দগ্‌দগা গ্রাম ভক্ত কবি কানাই বলাইর জন্মভূমি। কানাই-বলাইর পিতার নাম আশারাম নাথ। বলাই জ্যেষ্ঠ,—কানাই কনিষ্ঠ হইলেও লোকে কিন্তু "বলাই-কানাই" না বলিয়া, "কানাই-বলাই"ই বলিত। আমিও সকলের সঙ্গে সঙ্গে "কানাই-বলাই" বলিতেই বাধ্য হইলাম। অনেক দিন হয়, কানাই-বলাই মায়িক জগতের সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়া স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন।

কানাই-বলাই দুই ভাইই পরম ভক্ত ও কবি ছিলেন। ইঁহাদের রচিত অসংখ্য গীত আমাদের ময়মনসিংহে এবং ঢাকা, শ্রীহট্ট, পাবনা ও ফরিদপুরে অদ্যাপিও গীত হইতেছে। কিশোরগঞ্জের সন্নিকটবর্ত্তী ভাটগ্রাম নিবাসী কবি ঈশাননাথের মুখে শুনিয়া কানাই-বলাইর রচিত কয়েকটী গীত সংগ্রহ করিয়া এখানে উপস্থিত করিতেছি।

কানাইর ছয় পুত্রের মধ্যে একটীও নাই। বলাইর একটী বিধবা পুত্রবধূ আছেন মাত্র। কানাই-বলাই অতি বৃদ্ধ হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন। কানাই স্বাভাবিক জ্ঞান-বুদ্ধির বশীভূত ছিলেন, বলাই ছিলেন একমত উন্মাদ।

কানাইর মাল্‌সী।

দিনে দিনে দিন গেল দীন দয়াময়ি!—
(আমি) দীনহীন অজ্ঞানে চরণ চাই।
চরণ দেও যদি মা, নিজগুণে,
সাধনের জোর নাই॥
মনে করি সাধ্‌ব চরণ,
করি না সেই ভাবাচরণ,
কু আচরণ করে দিন কাটাই,—
রেখো অন্তকালে, চরণ তলে, বলে রাম কানাই॥

(২) লহর মাল্‌সী।

চিতান,—তুমি ত্রিগুণধারিণী তারা, বেদে শুন্তে পাই।
পারাণ,—তোমার নামের গুণ, তোমার চরণের যে গুণ,—
মা গো, সে গুণের সংখ্যা কিছু নাই।
লহর।— তুমি আদ্যাশক্তি তারা,
তোমায় ধর্‌তে দেও না ধরা,
জীবকে সারা, কল্লে মায়াজালে,
তোমার মায়াতে মা হয়ে মুগ্ধ,
বিষয় বিষে হলেম দগ্ধ,
সার পদার্থ সকলি যাই ভুলে।
মিল, — পাপ-পুণ্য মা তোমার কার্য্য
দোষের ভাগী আমি,—ঠিক বাজীকরের মেয়ের মত,
দেখাও ভোজের বাজী ভূমণ্ডলে।
মহড়া,—এমা দুর্গে! পাপ-পুণ্যের বিচার কর তুমি মা,
আমি সে ভার দিয়াছি তোমার চরণ কমলে॥
ধুয়া,——এ দেহে মা তুমি রাজা,
দেহ রাজ্যে তোমার প্রজা ছয় জনা এখানে,
তারা প্রজা হয়ে রাজার হুকুম আমলে না আনে,
ছয় জনা মা, প্রতিবাদী, সূক্ষ্ম বিচার কর যদি,
হয়ে ছয় জনার নামে ফৈরাদী,
আমি ডিক্রী পাব এক সওয়ালে॥
খাদ,—সাত্ত্বিকাদি ত্রিগুণ তারা,—আপনি সৃজিলে।
লহর, — আমি তর্‌ব তম গুণে,
এবার সার ভেবেছি মনে মনে,—
সত্ত্ব গুণের গুণ কি আছে বল,—
সাক্ষী আছে মৈষাসুরে
তমগুণ সে প্রকাশ করে,
মা তোমার এই রাজা চরণ পেল॥
মিল,——তমগুণে সাধন সিদ্ধি, সত্য জানা গেল,
জানি তমগুণে তরে গেল,
কালকেতু এক ব্যাধের ছেলে॥
(এমা দুর্গে গো! ইত্যাদি।)
ঝুমুর।—সদা তাই ভাবি মা বসে নিশি দিন।
কবে হবে আমার বিচারের দিন॥
বিচারের দিন যে দিন হবে,
ব্রহ্মরন্ধ্র ফেটে যাবে,
আমার সে দিন বা কিরূপে যাবে,
ভেবে হৈল এই তনু ক্ষীণ॥

সৌরভ

পঞ্চম বর্ষ | ময়মনসিংহ, পৌষ, ১৩২৩। | তৃতীয় সংখ্যা।

কোম্পানীর আমলের শিক্ষার অবস্থা ও ব্যবস্থা। *

"রাষ্ট্র বিপ্লবে দেশ উচ্ছন্ন হইয়া যায়।" বাঙ্গালার ভাগ্যে তাহা হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিপ্লবের বিরাট তাণ্ডবে বাঙ্গালী আপনার অন্যান্য অনেক সম্পদের সহিত সাহিত্য বৈভব হারাইয়া ফেলিয়াছিল। বাঙ্গালা সাহিত্যের যে উন্নত সৌধ বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস গড়িয়া তুলিয়াছিলেন; জ্ঞানদাস, মুকুন্দরাম, নারায়ণ দেব, বিজয়গুপ্ত, লোচন দাস, নরোত্তম দাস প্রভৃতি প্রাণপণ করিয়া যাহার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পন্ন করিয়াছিলেন; রামপ্রসাদ ও ভারতচন্দ্রের সন্ত তুলিকা যাহার অঙ্গরাগ বিধানে যত্ন করিতেছিল—অকস্মাৎ সে উন্নত সৌধ মহারাষ্ট্র বিপ্লবের তাণ্ডব তাড়নায় ও রাষ্ট্রপরিবর্ত্তনের বিরাট বিভীষিকায় কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেল, বাঙ্গালী তাহা চিন্তা করিবারও অবকাশ পাইল না। উৎকট ব্যাধিগ্রস্থ রোগীর অতীত স্মৃতি বিস্মরণের ন্যায় বাঙ্গালী তাহার অতীত সম্পদ একরূপ বিস্মৃত হইল।

রাষ্ট্র পরিবর্ত্তনে দেশে যে ভীতি ও ব্যাকুলতার ভাব আসিয়াছিল—দেশবাসীর মন হইতে সে ব্যাকুলতা ও ভয় বিদূরিত হইতে প্রায় দেড়শত বৎসর লাগিয়াছিল। এই সময় বাঙ্গালা দেশ বাঙ্গালীর চক্ষের সম্মুখেই নূতন আকারে দেখা দিয়াছিল। সুতরাং বাঙ্গলা সাহিত্য তাহাদের নিকট স্বপ্নের অলীক কল্পনায় পরিণত হইয়াছিল। সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লব-উৎসন্ন বাঙ্গালী আপন মাতৃভাষার চর্চ্চা এক রকম ত্যাগ করিয়া পরভাষা ভাষী ও বিকৃতভাষা ভাষী হইয়া পড়িয়াছিল।

ইংরেজের কৃপায় বাঙ্গালী ক্রমে তাহার ভাষা ও সাহিত্যের নবজীবন সঞ্চার করিতে সমর্থ হইয়াছে। তারপর আপন বিপুল চেষ্টায় স্তূপীকৃত ধূলি খুঁড়িয়া বিপ্লব-বিধ্বস্ত তাহার সেই প্রাচীনতম ভাষা ও সাহিত্যের বিপুল সৌধ পুনরুদ্ধার করিয়াছে। আজ ভাষার প্রাচীন ও নবীন সম্পদে বাঙ্গালী সম্পদশালী—ইহা ইংরেজ ও বাঙ্গালী উভয়ের পক্ষেই মহাগৌরবের বিষয়। কত উত্থান পতনের ভিতর দিয়া কত ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া, কত প্রতিকূলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া বাঙ্গলা ভাষা বর্ত্তমান সময় এইরূপ সম্পদশালী হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে একটা বিরাট ইতিহাসের কথা মনে পড়ে। আমরা তাহার সেই প্রাচীন ইতিহাস এখানে আলোচনা করিব না। পূর্ব্ব অধ্যায়ে আমরা কোম্পানীর রাজত্বের প্রথমার্দ্ধের বাঙ্গলা ভাষার যে নমুনা প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছি—এই অধ্যায়ে বাঙ্গালীর সেই মাতৃভাষা শিক্ষার আধুনিক ইতিহাস প্রদান করিতে চেষ্টা করিলাম।

মুশলমান শাসনকালে দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে আরব্য ও পারস্য ভাষা শিক্ষার জন্য এক একটী মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল; তাহা সরকারী ব্যয়ে পরিচালিত হইত। মুশলমান রাজত্বের অবসান হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এ দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। তাঁহারা শাসন সংরক্ষণের ভার গ্রহণ করিয়াও দেশীয় লোকের শিক্ষার ভার গ্রহণ করা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করেন নাই। ঐরূপ না করিবার তাহাদের কারণ ছিল—ঐ সময় ইংলণ্ডের রাজশক্তি ইংলণ্ডের জনসাধারণের শিক্ষার ব্যবস্থা রাজার কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিতেন না। এ সম্বন্ধে স্যার উইলিয়ম হাণ্টার লিখিয়াছেন:—

"During the early days of the East India Company's rule, the promotion of education was not recognised as a duty of government. Even in England at that time education was entirely left to private and mainly to clerical enterprise. A state system of instruction for the whole people is an idea of the latter half of the present century."

অর্থাৎ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন প্রাক্কালে

---

* 'সৌরভ' সম্পাদকের "বাঙ্গালা সাময়িক সাহিত্য" নামক যন্ত্রস্থ গ্রন্থের একটী অধ্যায়।

"Life and Times of Carey, Marshman and Ward The good old days of Hon'ble John Company, Adam's Report, Report of the G. C. P. I. 1838, Calcutta report. Report of the School Book Society, selections from Calcutta Gazettes, Calcutta Reviews, The

করেন। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টও তাহা মুদ্রিত হইতে দেওয়া নিরাপদ মনে না করিয়া তাহা অগ্রাহ্য করেন। বুকানন স্বাধীন দেশের স্বাধীন লোক; তিনি কাহারও আদেশ গ্রাহ্য না করিয়া বড় বড় অক্ষরে তাহার পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া রাজপুরুষদিগের মনে ঝড় তুলিয়া দিয়াছিলেন।

১৮০৭ অব্দের শেষ ভাগে শ্রীরামপুর মিসন প্রেস হইতে মুশলমান ধর্ম্মের উপর খৃষ্টীয় ধর্ম্মের প্রাধান্য কীর্ত্তন-করিয়া একখানা পারস্য ভাষার পুস্তিকা প্রচারিত হয়। কলিকাতার এক মুশলমান ব্যবসায়ীর পুত্র এই পুস্তিকা প্রাপ্ত হইয়া তাহার অধ্যাপককে একটা প্রতিবাদ লিখিয়া দিতে অনুরোধ করেন। এই পুস্তিকা ঘুরিয়া ফিরিয়া গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী এড্‌মনষ্টোনের হস্তে উপস্থিত হয়; তখন গবর্ণমেণ্ট হাউসে বিষম ভীতি-ভাব সঞ্চারিত হইয়া উঠে। ডাঃ কেরি আহূত হন। লর্ড মিণ্টো ডেনিস গবর্ণরকে মিসনারিদিগের হস্ত হইতে এই পুস্তিকা ছিনাইয়া লইয়া পাঠাইতে অনুরোধ করেন। অবিলম্বে সমস্ত কাগজ ভস্মে পরিণত হইয়া যায়।

এইরূপ ভীতিভাব লইয়াই সে কালের রাজপুরুষগণ এদেশে রাজ্য শাসন করিয়া গিয়াছিলেন। এরূপ অবস্থায় তাঁহাদের পক্ষে সহসা কোন প্রকার সংস্কারে হস্তক্ষেপ করা তাঁহারা একেবারেই নিরাপদ ও সঙ্গত মনে করেন নাই।

ক্রমশঃ।

সের সিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

গ্রামখানি যে খুব বড় তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ইহার অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় ৫ হাজার। গ্রামের সর্দ্দার মহাশয় এ অঞ্চলে রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমরা আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতেছি এমন সময় তাঁহার প্রধান কর্ম্মচারী কাপ্তেন সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য উপস্থিত হইলেন।

কর্ম্মচারী মহাশয়ের গলদেশ হইতে পা পর্য্যন্ত এক খানা দীর্ঘ বস্ত্রে আবৃত ছিল। মস্তকে বা পায়ে কোনও আবরণ ছিল না। উহার দক্ষিণ হস্তে এক সুদীর্ঘ বল্লম। লোকটার সুদীর্ঘ বপু, কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকে কৃষ্ণবর্ণের বড় বড় চুল ও হস্তে বল্লম থাকাতে সেই রাত্রি কালে উহাকে বড়ই ভয়ানক বলিয়া মনে হইল। যাহা হউক, তাঁহার সহিত আরও তিন জন লোক উপস্থিত ছিল। ইহাদের চেহারাও অনেকটা প্রথমের মত, তবে অত লম্বা নয়।

কর্ম্মচারী বলিলেন যে তাঁহার প্রভু ইংরাজ আগমনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। তাঁহার একান্ত অনুরোধ যে নবাগতেরা সকলে তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করেন। তিনি চিরদিনই ইংরাজের বন্ধু। সাহেব দুইজন গাইডের সহিত কিয়ৎকাল পরামর্শ করিয়া বলিলেন যে তাঁহার প্রভুর ভদ্রতায় তাঁহারা অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছেন। কল্য প্রাতঃকালে যে তাঁহারা তাঁহার রাজার অতিথি হইবেন, তাহা কাপ্তেন সাহেব স্বীকার করিলেন।

পরদিবস আমরা সকলে রাজবাড়ীর এক অংশে যাইয়া আশ্রয় লইলাম। সমস্ত বাড়ীখানা মৃত্তিকা নির্ম্মিত। প্রায় ৬।৭ বিঘা জমির উপর উহা প্রস্তুত হইয়াছে। বাড়ীখানা একতালা। ঘরগুলি বেশ বড় বড়, তবে জানালা নাই। ঘরের ছাদের উপর প্রথমে কাঠ বিছান হইয়াছে, তাহার উপর মাটী ফেলিয়াছে। এ অঞ্চলে বৃষ্টি খুব কম বলিয়া গ্রামের অধিকাংশ বাড়ীই এইভাবে প্রস্তুত হইয়াছে। যাহারা নিতান্ত দরিদ্র, তাহাদের বাড়ী তাল পাতার ছাওয়া।

গ্রামের অধিবাসীরা শম্বুরু জাতি নামে প্রসিদ্ধ। আফ্রিকার এই অঞ্চলে প্রায় ২ লক্ষ শম্বুরু বাস করে। ইহারা স্ত্রী পুরুষ সকলেই দীর্ঘাকার, গায়ের রং ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। তবে সুশ্রী। গ্রামের অধিবাসীরা একবারে অসভ্য নয়। কাহাকেও উলঙ্গ দেখিলাম না। স্ত্রীপুরুষ প্রায় সকলেরই কটিদেশ হইতে জানু পর্য্যন্ত বস্ত্রাবৃত—অপর সমস্ত অংশ খোলা। বাঙ্গালীদের ন্যায় ইহারা মাথায় কোনও প্রকার আচ্ছাদন ব্যবহার করে না। আফ্রিকার অন্যান্য অসভ্য জাতির ন্যায় ইহারাও অত্যন্ত উল্কী ব্যবহার করে। ইহাদের মধ্যে যাহারা

লোক দেখিতে পায় নাই যে তাহাদের এই আদর্শের পূর্ণ সিদ্ধি সম্ভব হইবে না। পরিপূর্ণ সাম্য ও মৈত্রী শুধু ফরাসী দেশে নয়, কোথাও আসে নাই, এবং জগতে কখনও আসিবে কিনা সে বিষয়েও অনেকে সন্দেহ করেন। তথাপি বাস্তব জগতে সম্পূর্ণরূপ সম্ভাব্য না হইলেও এই মন্ত্রের উৎপ্রেরণা না থাকিলে ফরাসী বিপ্লব যাহা করিয়াছে তাহা সাধিত হইত না। সুতরাং সাহিত্যিক-দের কল্পনা সম্পূর্ণ সিদ্ধ না হইলেও, তাহারা সমাজের চিন্তা যে কোনও এক বিশিষ্ট দিকে চালিত করেন তাহার ক্রিয়া রাষ্ট্রে ও সমাজে প্রকাশ না পাইয়া পারে না। বর্ত্তমানে রুশিয়া দেশ তাহার আর একটী দৃষ্টান্ত।

রুশিয়া প্রকাণ্ড দেশ। ইউরোপ ও এশিয়ার এক প্রকাণ্ড অংশ লইয়া এই বিশাল সাম্রাজ্যের বিপুল কলে-বর পুরিয়াছে। জায়গার অনুপাতে লোকসংখ্যা তত বেশী না হইলেও সমষ্টিতে নিতান্ত কম নহে। এত বড় একটা জন-সঙ্ঘের মধ্যে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী, বহু ভাষাভাষী পৃথক্ পৃথক্ জাতির লোকের একত্র সমাবেশ সত্ত্বেও একদেশবাসী ও এক রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দরুণ ইহাদের মধ্যে একটা স্থূল ঐক্য রহিয়াছে। এবং ইহাদের একটা রাষ্ট্রীয় ইতিহাসও রহিয়াছে। খুব প্রাচীন না হইলেও অন্ততঃ দুইশত বৎসর পূর্ব্বে জগ-তের ইতিহাসে রুশের নাম অনেকবার উঠিয়াছে। ইংলণ্ডের সঙ্গে, ফরাসীদেশের সঙ্গে এবং ইদানাং চীন ও জাপানের সঙ্গে রুশের বহু সংঘর্ষ হইয়াছে; এবং প্রায়শঃই পরাজিত হইলেও, দূর হইতে প্রহারের মত এই সকল পরাজয় রুশ-দেহে কাহারও স্থায়ী আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই। এই সকল পরাজয় সত্ত্বেও, বরং রুশ-সাম্রাজ্যের কলেবর বৃদ্ধিই পাইয়াছে। রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে রুশ সুতরাং নিতান্ত নগণ্য নহে।

তথাপি দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি সভ্যতার যে সকল উপকরণ রহিয়াছে সে গুলির ইতিহাসে রুশের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ দেখা যায় না। দর্শনশাস্ত্রের যে কয়খানা নাম-করা ইতিহাস আছে তাহাদের বেশীর ভাগই জর্ম্মাণ পণ্ডিতদের লেখা। কিন্তু সেগুলিতেও ফ্রান্স ও ইংলণ্ডের ভূয়োভূয়োঃ উল্লেখ ছাড়া চলে নাই। এমন কি, এমন যে অধঃপতিত দেশ হিন্দুস্থান তাহারও নাম করিতে হইয়াছে। অবশ্যই গভীর জ্ঞান পরিপূর্ণ জর্ম্মাণ মনেও ভারত সম্বন্ধে জ্ঞান খুব বেশী নহে। ইউবারবেগ্ নামক প্রসিদ্ধ দার্শনিক-ঐতিহাসিক শকুন্তলাকে ও মনু-সংহিতাকে ভারতীয় দর্শনের অন্যতম প্রধান গ্রন্থ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এবং আশ্চর্য্যের বিষয় কিছুই নহে, যে ইহাদের ভিতর তিনি দার্শনিক তত্ত্ব তেমন কিছু পান নাই। ইউবারবেগের পরে ইউরোপ ভারত সম্বন্ধে অবশ্যই আরও জানিয়াছে। ইউবার্ বেগের মত লোকও ভারতের উল্লেখ আবশ্যক মনে করিয়াছেন। কিন্তু কই, রুশিয়ার ত সেখানে উল্লেখ নাই। তেমনই বিজ্ঞান ও ফলা শিল্পেও রুশিয়ার বিশিষ্টতার তেমন কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষতঃ চতুর্দ্দশ লুইর আমলে ফরাসী সাহিত্য ও চিন্তার প্রভাব সমস্ত ইউরোপে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল; এমন কি জর্ম্মেণীতেও তাহার প্রচুর আধিপত্য ছিল। কিন্তু জর্ম্মেণী তার পরে নিজের জাতীয় একটা বিশিষ্ট ধারা বুঝিয়া লইয়াছে, রুশিয়ায় বোধ হয় এখনও তাহা সম্পূর্ণ রূপে হয় নাই।

কিন্তু বিগত শতাব্দীতে বিশেষতঃ তাহার শেষভাগে রুশিয়ায় রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্ত্তন বহু হইয়া গিয়াছে। রুশিয়াতে ক্রীতদাস প্রথারই একটা প্রকারান্তর অনেক কাল বর্ত্তমান ছিল। আমাদের দেশে যেমন নান্‌কার জমী দিয়া সম্ভ্রান্ত লোকদের ঘরে পুরুষানুক্রমিক 'গোলাম' রাখা হইত এবং এখনও যেমন স্থানে স্থানে এই প্রথার কোমলতর রূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে, রুশিয়াতে প্রায় সমস্ত কৃষকই এক সময়ে ভূম্যধিকারীর এইরূপ নানকার প্রজা ছিল এবং ভূম্যধিকারীর যত কিছু কাজ তাহা এই সকল নানকারভোগীরাই করিত; এমন কি, বিলাসী রোমে যেমন ছেলেপিলেদের লেখাপড়া শিক্ষার ভারও এক সময়ে ক্রীত-দাসের উপর পড়িত, রুশেও তেমনই এই নানকার ভোগীরা প্রভুর ছেলেদিগকে লেখাপড়া শিখাইত, সঙ্গী-তাদি দ্বারা প্রভুর মনোরঞ্জন করিত, এবং গৃহ কর্ম্মের অন্য সকল কাজও ইহাদেরই দ্বারা সম্পন্ন হইত। ইহা

এক প্রকার ক্রীত-দাস প্রথা এবং রুশিয়ার জাতীয় প্রকৃতি বাহ্য দৃষ্টিতে অন্ততঃ যেমন কঠোর, ইহার ভিতরও সেই রূপ একটা কঠোরতা বর্ত্তমান ছিল। আমেরিকাতে যখন নিগ্রো ক্রীতদাস রাখা প্রচলিত ছিল, তখন যেমন পলাইয়া যাওয়া ক্রীত-দাসের পক্ষে একটা সাঙ্ঘাতিক অপরাধ ছিল, রুশিয়াতেও তেমনই এই প্রকার ক্রীত দাসেরা যে ইচ্ছামত নানকার পরিত্যাগ করিবে এবং দাসত্ব হইতে মুক্ত হইবে, সে উপায় ছিল না।

অর্থশাস্ত্রবিদেরা বলেন, যে সমাজে অস্থাবর সম্পত্তির মত ভূমিরও সহজ ক্রয়-বিক্রয় না চলে সে সমাজ অর্থ শাস্ত্রের চক্ষে অন্ততঃ তেমন উন্নত নহে। আমাদের দেশে—বিশেষতঃ বাংলার স্থানে স্থানে এখনও দেখা যায় এক খণ্ড ভূমির উপর পাঁচ সাত জনের পাঁচ সাত রকমের অধিকার বর্ত্তমান রহিয়াছে। জমীদার, তালুকদার, পত্তনীদার, জোতদার, বর্গাদার, এবং 'গণ্ডস্যোপরি বিস্ফোটকঃ' রেহানদার—প্রভৃতি বহু 'দায়ের' ধার এক খণ্ড ভূমি ধারিয়া থাকে। এরূপ স্থলে এমনও ঘটে যে, নিজের কষ্টোপার্জ্জিত অর্থ দ্বারা ক্রয় করিয়াও ক্রেতা ভূমিতে প্রবেশ করিতে পায় না। এবং যদিও প্রত্যেকেই প্রায় তাহার স্বত্ব বিক্রয় করিবার অধিকার রাখে, তথাপি অন্য সব জিনিসের মূল্য যেমন সাধারণতঃ বাজারে উপস্থিত জিনিসের পরিমাণ এবং ক্রেতার আগ্রহ ও তাহাদের সংখ্যার উপর নির্ভর করে, ভূমির বেলা প্রায়ই তাহা নহে। সেখানে দেশাচার—গ্রাম সরহ তাহার মূল্য ঠিক করিয়া দেয়। দৃষ্টান্ত, ভূম্যধিকারী যখন তাহার স্বত্বের কতক অংশ বিক্রয় করিতে চায় অর্থাৎ জমী পত্তন করিতে চায়, তখন সে যদি ভূমিগ্রহণেচ্ছু প্রজার গরজ অনুসারে ভূমির খাজানা ধার্য্য করিয়া লয় তাহা হইলে আইন তাহা অত্যন্ত সন্দেহের চক্ষে দেখিবে। অথচ, বহু ক্রেতা যেখানে উপস্থিত সেখানে মাছ তরকারী বিক্রেতা যদি সুবিধা বুঝিয়া জুলুম দাম আদায় করে তাহা হইলেও আইন অন্যায় মনে করে না। ক্রয় বিক্রয়ের বাজারে ভূমির এই স্থাণুবৎ নিশ্চলতা অনেকের মতে সমাজের অনুন্নতির লক্ষণ। কিন্তু রুশিয়ার ভূমি আমাদের ভূমির চেয়েও স্থাণু ছিল। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশে অন্ততঃ ভূমি একাধিক ব্যক্তির স্বত্ব অক্লেশে বহন করিতে পারে, এবং কৃষকের স্বত্ব আইনের রক্ষকতায় সুরক্ষিত; কিন্তু রুশিয়াতে যারা চাষ করিত তাহাদের বৃক্ষের মত ভূমিতে শিথর-বদ্ধ হইয়া থাকিবার অধিকার ছাড়া অন্য অধিকার কিছু ছিল না। বিক্রয় বা পরিত্যাগের স্বাধীনতা তাদের ছিল না। কিন্তু বিগত শতাব্দীর প্রথমভাগে এই প্রথা লুপ্ত হইয়াছে এবং সাধারণের রাষ্ট্রীয় অধিকারের প্রথম সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে।

ইহার পর রুশিয়া এতদূর অগ্রসর হইয়াছে—রুশিয়ার জনসাধারণের অধিকার এতদূর বর্দ্ধিত হইয়াছে যে, ইংলণ্ডের পার্লেমেণ্টের অনুকরণে 'ডুমা'-নামক একটা প্রতিনিধি-সভার প্রতিষ্ঠা পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে। অবশ্যই ইংলণ্ডের অনুকরণ পূর্ণতা লাভ করে নাই, তথাপি সাধারণের অধিকার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছে। আগে যেখানে রাজা এবং উচ্চ রাজসচিবেরা সুরক্ষিত না হইয়া সাধারণের সমক্ষে বাহির হইতে সাহস পাইতেন না, সেখানে সেদিন সম্রাট্ স্বয়ং 'ডুমায়' পদার্পণ করিয়া ইহাকে দেশের শাসন পরিচালনের একটী অঙ্গ বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। মনে হয়, রুশিয়ার রাষ্ট্রীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে; এবং কেহ কেহ আশা করেন, এক সময়ে ফরাসী সভ্যতার যেমন দোহাই চলিত, কিছু দিন পূর্ব্বেও সমগ্র জগতে যেমন জর্ম্মাণ সভ্যতার দোহাই চলিত, কালে রুশিয়ার সভ্যতাও সেরূপ স্থান অধিকার করিতে পারিবে। ভবিষ্যতে যাহা হউক, আধুনিক যুগে রাষ্ট্রীয় উন্নতির প্রথম সোপান যে সাধারণের অধিকার-বৃদ্ধি, রুশিয়ার নবীন ইতিহাসেও তাহার প্রমাণ পাই।

কুসুম কলির ফুটিবার সংবাদ তাহার সুবাস বহন করিয়া আগেই যেমন প্রাভাতিক সমীরণ দিয়া থাকে, জাতির জাগরণের পূর্ব্বাভাসও তেমনই সাহিত্যে পাওয়া গিয়া থাকে। রুশিয়ার এই নব জাগরণের পূর্ব্বাভাস যে সকল সাহিত্যিকের মনে ফুটিয়া উঠিয়াছিল, টলষ্টয় ও ডোষ্টয়েফ্স্কী তাঁহাদের অন্যতম। ইহাঁরা উভয়ই প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক।

টলষ্টয় তাঁহার লেখায় এবং কার্য্যে সাধারণের প্রতি যে অনুরাগ দেখাইয়াছেন, তাহার কাহিনী দীর্ঘ। কিন্তু

৭। সর্ব্বদা একস্থানে নির্জ্জনে ব'সিয়া থাকিবেনা।

৮। বানর, কিংবা কানা খোঁড়া দেখিবেনা।

৯। ভয়াবহ দৃশ্য দেখিবে না।

১০। শকট-শিবিকায় কিংবা পদব্রজে স্থানান্তরে গমন করিবে না।

এই গুলি সম্বন্ধে নিষেধ করারও বিশেষ কারণ আছে। একটু অভিনিবিষ্ট হইয়া চিন্তা করিলেই সহজে হৃদয়ঙ্গম হয়।

১। কু-দৃশ্য দেখিলে সন্তান কু-ভাবাপন্ন হয়।

২। কু-কথা শ্রবণ করিলে সন্তানও তদভাবাপন্ন হয়।

৩। কোনও অপবিত্র ভাব হৃদয়ে পোষণ করিলে গর্ভস্থ সন্তানের হৃদয়ও অপবিত্র ভাবেই গঠিত হয়।

৪। গর্ভিনীর দিবা নিদ্রায় সন্তান অত্যন্ত নিদ্রালু হয়।

৫। গর্ভিনী চেঁচাইয়া কথা বলিলে সন্তানও কর্কশ ভাষী হয়।

৬। গর্ভিনী দ্রুতপদে গমন করিলে হঠাৎ পদস্খলিত হইয়া গর্ভস্থ সন্তান অকালে ভূমিষ্ঠ হওয়ার সম্ভাবনা।

৭। গর্ভিনী সর্ব্বদা একস্থানে বসিয়া থাকিলে গর্ভিনীর আলস্য—অবসাদের সঞ্চার হইয়া থাকে ও প্রসবকালে অত্যন্ত যন্ত্রণা পাইতে হয়, এবং সন্তানও অত্যন্ত আলস্য পরায়ণ হইয়া থাকে।

৮। কাণা, খোঁড়া দেখিলে গর্ভস্থ সন্তানও কাণা খোঁড়া হইবার আশঙ্কা থাকে।

৯। দয়াবহ দৃশ্য দেখিলে সন্তান অত্যন্ত দয়ালু হয়।

১০। শকট শিবিকার অস্বাভাবিক্ অঙ্গ সঞ্চালনে গর্ভস্থ সন্তান অপূর্ণ সময়েই ভূমিষ্ট হইতে পারে।

এইগুলি সম্বন্ধে নিষেধ করার কারণ প্রদর্শিত হইয়াছে। গর্ভাবস্থায় জননীর মনোবৃত্তি সমূহ দ্বারা সন্তানের মনোবৃত্তি সমূহ গঠিত হয়; সুতরাং দোহদের পর গর্ভিনীর এইগুলি অবশ্য পালনীয়।

আমরা গর্ভ দোহদ সম্বন্ধে ভবভূতি বা শ্রীকণ্ঠ কথিত আরও ২।৪টী কথা বলিয়া এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব। রাম, রাজপদে অভিষিক্ত হওয়ার সময়, অযোধ্যাগত রাজর্ষি জনক উৎসবান্তে মিথিলায় গমন করিলে পর, পিতৃ-বিরহ ক্লিষ্টা সীতার চিত্তবিনোদনার্থ যেরূপ, 'আলেখ্যে দর্শন' নাটকীয় অঙ্কে সংযুক্ত করিয়া নাটকের উৎকর্ষ সংসাধন করিয়াছেন, অপর পক্ষে সমাজ তত্ত্বজ্ঞ ভাবুক কবি ভবভূতি গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম, রীতি, নীতি, আচার, ব্যবহার ও তাৎকালীক সামাজিকতা প্রদর্শন করাইয়াছেন। কবি ভবভূতি যখন চিত্র-পট উন্মুক্ত করিয়া লক্ষ্মণ কর্ত্তৃক দেখাইতে লাগিলেন—"আর্য্যে! দৃশ্যতাং দ্রষ্টব্য মেতৎ—অয়ঞ্চ ভগবান্ ভার্গবঃ।" অর্থাৎ ইহা দেখিবার বিষয় বটে, আর্য্যে, ঐ দেখুন, ভগবান্ ভার্গব —পরশুরাম। লক্ষ্মণ এই কথা বলিতেই তাঁহাকে বাধা দিয়া রাম বলিলেন—"বৎস, বহু দেখিবার বিষয় আছে —অন্যান্য চিত্র প্রদর্শন করাও।" এস্থানে কবির এরূপ বলিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে। সেই ত্রিসপ্তবার ক্ষত্রান্তক পরশুরামের চিত্র দর্শন করিলে বাস্তবিকই একটু ভয়ের সঞ্চার হইয়া থাকে। বিশেষতঃ গর্ভিনীর হৃদয়ে স্বাভাবিকই ভয়ের সঞ্চার একটু বেশী হইয়া থাকে। গর্ভাবস্থায় ভয়াবহ দৃশ্য দেখিলে গর্ভস্থ সন্তান অত্যন্ত ভীরুতা প্রাপ্ত হয় তাই কবি সে দৃশ্য দেখাইতে রামের মুখ দিয়া নিষেধ করিয়াছেন—এইরূপ বলা বোধ হয় অসঙ্গত হইবে না।

এক্ষণে দেখা যাইতেছে—দোহদ বা সাধ ভক্ষণ যদিও বেদ বিধির ন্যায় পালিত হইয়া আসিতেছে—বাস্তবিক পক্ষে উহা গর্ভস্থ সন্তানের ও গর্ভিনীর স্বাস্থ্য রক্ষার জন্যই শারীরতত্ত্ব ও মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইয়াছে। পরে যখন উপর্য্যুক্ত নিয়মগুলি পালনের মঙ্গলপ্রসূ ফল লাভ হইতে লাগিল তখন তৎকালের গ্রন্থকারগণ স্বীয় স্বীয় গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া লইয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় বৃদ্ধা রমণীগণও বলিয়া থাকেন—'দোহদ বা সাধ ভক্ষণ না করাইলে, গর্ভস্থ সন্তান পরিপুষ্ট বা সর্ব্বাঙ্গ সম্পন্ন হয় না।' এইকথা যে ধ্রুব সত্য, তদ্বিষয়ে আর সন্দেহ নাই। পূর্ব্বেই বলিয়া আসিয়াছি—'গর্ভাবস্থায়, গর্ভিনীর যে কোনও ইচ্ছার নামই দোহদ বা সাধ।' উত্তর চরিতে দেখিতে পাই জানকীর তপোবন দেখিবার ও ভাগীরথীতে অবগাহন করিবার সাধ হইয়াছিল।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-গ্রন্থাগার
ক্রমিক সং
শ্রেণী সং
কলিকাতা।

সৌরভ

পঞ্চম বর্ষ | ময়মনসিংহ, মাঘ, ১৩২৩। | চতুর্থ সংখ্যা।

বঙ্গ-সাহিত্যের ভবিষ্যৎ।

(বাঁকিপুর সাহিত্য সম্মিলনের সভাপতির অভিভাষণ)

"সাজাইতে মাতৃভাষা, সদা যা'র মনে আশা,
নাশিতে স্বদেশবাসি-অজ্ঞান-তিমির।
জন্মভূমি-জননীর, মুছাতে নয়ননীর,
দিবসযামিনী যার পরাণ অধীর॥
রত্নপ্রসূ বসুধার সে রত্ন-সন্তান।
এ মর-ধরণী' পরে অমর সমান॥"

সমবেত সভ্যমণ্ডলী, দেখিতে দেখিতে বঙ্গীয়-সাহিত্য সম্মিলন দশম বর্ষে উপনীত হইল। বঙ্গের সাহিত্য-সেবিগণ প্রতিবর্ষে, কোন স্থানে সম্মিলিত হইয়া, মাতৃ-ভাষার চরণকমলে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করেন, নানা-রোগ-জর্জ্জর বঙ্গভূমির প্রিয়সন্তানবৃন্দ, এই সম্মিলনের তিন দিন, আপন আপন সুখ দুঃখ অভাব অভিযোগ,—সমস্ত একপদে বিস্মৃত হইয়া মাতৃভাষার পবিত্র মন্দিরে, সাধকের ন্যায় উপবিষ্ট হন, ইহা বাঙ্গালীর পরম মঙ্গলের কথা, শ্লাঘার কথা। মহাকবি ভারবি বলিয়াছেন,—যাহার যেটুকু আছে, সে যদি সেইটুকুতেই সুস্থ থাকে, অভ্যুদয়ের দিকে আর না তাকায়, তবে, মনে হয়, বিধাতা ঐ ব্যক্তির সম্বন্ধে একপ্রকার নিশ্চিন্ত হইয়াই, তাহার আর শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন না। সংসারী জীবের পক্ষে এ উক্তি সর্ব্বথা প্রযোজ্য। অনেক চেষ্টায়, অনেক পরিশ্রমের ফলে বঙ্গভাষা বর্ত্তমানকালে যে অবস্থায় আসিয়া উপনীত হইয়াছে, সেই অবস্থাতেই সন্তুষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়া থাকিলে, অদূর ভবিষ্যতে বঙ্গভাষার বিশেষ অবনতি ঘটিবার সম্ভাবনা। কেননা, যে সকল গ্রন্থকে স্তম্ভস্বরূপ আশ্রয় করিয়া বঙ্গভাষা এই প্রতি-যোগিতা-সঙ্কুল, সংসারক্ষেত্রে অক্ষয়ত্ব লাভ করিতে পারে, এখনও বঙ্গভাষায় তাদৃশ গ্রন্থাদি তত অধিক পরিমাণে উপনিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং আমাদের নীরব হইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। যাহাতে বঙ্গবাসি-জন-গণের হৃদয়ে সর্ব্বদা বাঙ্গালা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি-কামনায় একটা বিক্ষোভ অর্থাৎ একটা তরঙ্গ উত্থিত থাকে, বাঙ্গালী হৃদয় কোন সময়ের জন্য নিস্তরঙ্গ, স্রোতোহীন, শৈবালপূর্ণ আবিল জলরাশির ন্যায় হইয়া না পড়ে, সেবিষয়ে সর্ব্বদা যত্ন-পর থাকিতে হইবে। বঙ্গভাষা-বিষয়িণী আলোচনা দেশের সর্ব্বত্র আরও অধিকতররূপে আরব্ধ করিতে হইবে। আমার এত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে অনেকে বলেন, এই সাহিত্য-সম্মিলনের কোন উপযোগিতা নাই। বর্ষে বর্ষে এতগুলি টাকা ব্যয় করায় ভাষার তেমন কি অভ্যুদয় হইয়াছে। এই দীর্ঘ দশ বৎসরে বাঙ্গালা-ভাষার কোনই ত উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি দেখিতে পাই না। তবে এ আন্দোলনের আবশ্যকতা কি?"—ইত্যাদি। যাঁহারা এই কথা বলেন, দুঃখের বিষয়, আমি তাঁহাদের সহিত একমত হইতে পারিলাম না। অনন্ত কালের সমক্ষে যাহাকে বাঁচিয়া থাকিতে হইবে, তাহার পক্ষে দশ বৎসর বা দশশত বৎসর নিমেষতুল্য বলিলেও বলা যাইতে পারে। যদি আমরা আমাদের জাতীয়তা সঞ্জীবিত রাখিতে চাই, তবে সর্ব্বাগ্রে জাতীয় সাহিত্য গঠন আবশ্যক। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে, বাঁচিবার উপায় উপকরণগুলির প্রতি সর্ব্বদা

সমস্ত ভুলিয়া, আপনা ভুলিয়া,—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও মলিন স্বার্থের পুটুলিগুলি দূরে এককোণে সরাইয়া রাখিয়া, একমনে একপ্রাণে কার্য্য করুন,—তবেই ত আপনাদের স্পৃহণীয় মৎস্য চক্র ভেদ করিতে পারিবেন। একই তীর্থের যাত্রী আপনারা, একযোগে অগ্রসর হউন,—ভিন্নপথে বা অপথে যাইয়া সংহতিক্ষয়পূর্ব্বক অবসন্ন হইবেন না।

বাঙ্গালার আজ বড় শুভদিন, বড় আনন্দের দিন। বঙ্গের আবালবৃদ্ধবনিতা, সকলেই বঙ্গভাষার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। সকলেরই মনে একটা আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে যে, কি প্রকারে বঙ্গভাষাকে সজ্জিত করিবেন। ধনি নির্ধন নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যেই একটা প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হইতেছে। ইহা পরম মঙ্গলের কথা। যখন "বান" আসে, তখন অনেক আবর্জ্জনাও তাহাতে ভাসাইয়া আনে, সত্য, কিন্তু সেই আবর্জ্জনারাশি তটিনীর উভয় তটেই জমিয়া জমিয়া ক্রমে মাটীতে পরিণত হয়। তদ্রূপ বর্ত্তমান সময়ে অবশ্য বঙ্গভাষার এই নবীন বন্যায় অনেক আবর্জ্জনাও আসিতেছে, অনেক অপাঠ্য কুপাঠ্য গ্রন্থ বা প্রবন্ধাদি বিরচিত হইতেছে, সত্য, কিন্তু সেগুলি কদাচ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইতে পারিবে না। যাহা উত্তম সৎ, যাহা নির্ম্মল নিষ্পাপ, তাহাই থাকিয়া যায়, তদিতর কালের অতলগর্ভে অচিরেই বিলয়প্রাপ্ত হয়। সুতরাং ঐ সকল অপাঠ্য কুপাঠ্য বিষয়ের জন্য বঙ্গভাষার হিতৈষিবৃন্দের তত চিন্তার কারণ নাই। দেশের সর্ব্বত্র, বাঙ্গালী জাতির সর্ব্বত্র, যথার্থই যেন একটা সাড়া পরিয়া গিয়াছে। বাল্যে যে সকল উপকথা রূপকথা শুনিতে শুনিতে মাতা বা মাতৃষসার কোলে ঘুমাইয়া পড়িতাম, আজ নগরের রাজপথের উভয় পার্শ্বে যখন সেই সকল, গল্প, সেই "সাতভাই চম্পা",—সেই "পক্ষিরাজ ঘোটক", সেই 'শিবঠাকুরের বিয়ে', প্রভৃতি শিশুরঞ্জন কথাসমূহ যথার্থই নয়ন রঞ্জন গ্রন্থাকারে নিবদ্ধ হইয়াছে, দেখি, তখন এক অপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করি। বটতলায় যে কৃত্তিবাস কাশীদাসের কঙ্কাল রক্ষিত হইত, আজ তাহাতে নবজীবন সংযোগ দেখিয়া প্রীতিবিহ্বল হইয়া পড়ি। মানুষ যতদিন নিজের সত্তার উপলব্ধি না করে ততদিন প্রকৃতমানুষই হইতে পারেনা। আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার কি ছিল, কি নাই, কি অর্জ্জন এবং কতটুকুইবা বর্জ্জন করিতে হইবে, এ চিন্তা যে করে না, সে নরাকার হইতে পারে, কিন্তু তাহাকে নর বলিতে পারি না। বাঙ্গালী এতদিনে নিজের মাকে চিনিয়াছে, মা-নাম যে কি মধুর, মা-নামে যে কত তৃপ্তি, তাহা এতদিনে বঙ্গ সন্তান বুঝিতে পারিয়াছে, তাই বাঙ্গালীর প্রাণে একটা নবীন বলের সঞ্চার দেখিতে পাইতেছি। বঙ্গভাষার প্রতি এই যে একটা দেশব্যাপিনী অনুরক্তির লক্ষণ, ইহাকে রক্ষিত এবং ক্রমে বিবর্দ্ধিত করিতে হইবে। জাতীয় জীবন গঠনের মূলমন্ত্র হইল, জাতীয় সাহিত্য নির্ম্মাণে স্পৃহা। সেইস্পৃহা যখন হৃদয়ে একবার জাগিয়াছে, বঙ্গভাষার প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ জাতির হৃদয়ে দেখা দিয়াছে, তখন আর চিন্তার কারণ নাই। পালে যখন বাতাস বাধিয়াছে, তরণী এইবার পক্ষিণীর মত চলিবে, আমাদিগকে শুধু সাবধান হইয়া, হাল ধরিয়া বসিতে হইবে। যাহাতে গন্তব্যের বিপরীত দিকে না যাইয়া পড়ি, সেপক্ষে সতত সতর্ক থাকিতে হইবে। আর যখন যতটুকু আবশ্যক, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, আমার তরণীকে অনুকূল বায়ুর বশীভূত, করিয়া পরিচালিত করিতে হইবে যে সময়ে এইরূপ গুরুতর কর্ত্তব্যের ভার আমাদের স্কন্ধে ন্যস্ত, তখন কি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতামত লইয়া আত্মবিচ্ছেদ শোভা পায়? যে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে, তাহাকে সেচনাদির দ্বারা বিবর্দ্ধিত, পল্লবিত ও পুষ্পিত করিতে হইবে অঙ্কুরটির মস্তক ভগ্ন করিয়া লাভ কি? আপামর সাধারণের মধ্যে যাহাতে বঙ্গভাষার প্রতি অনুরক্তি জন্মে, আমরা বাঙ্গালী, বাঙ্গালী বলিয়া পরিচয় দিতে হইলে, বাঙ্গালা ভাষার সেবক হওয়া চাই, এই ধারণা যত অধিক বদ্ধমূল হইয়া যাহাতে দেশবাসীর হৃদয়ে চিরদিনের মত থাকিয়া যায়, তত পক্ষে চেষ্টাপর হইতে হইবে। এই সময়েই ভুলিলে চলিবে না, যে যাঁহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে শিক্ষা প্রাপ্ত হন বা হইয়াছেন, অথবা যাঁহারা বঙ্গভাষার আলোচনা করেন, মাত্র তাঁহাদিগকে লইয়াই বঙ্গদেশ নহে। কোন

ইতিহাস।

[সাহিত্য-সম্মিলনের ইতিহাস-শাখার সভাপতির অভিভাষণ]

প্রাচীন লীলার ক্ষেত্রের দিকে তাকাইলে দীর্ঘনিঃশ্বাসে বাজিয়া উঠে "বাঁশরী বাজাতে গিয়ে বাঁশরী বাজিল কই।" যে পবিত্র ক্ষেত্রে আজ আমাদের এই সম্মিলন ও উৎসব, ইহাই যে বঙ্গ-সভ্যতার ও বাঙ্গালী জাতির ইতিহাসের জন্মভূমি, তাহাই বিশেষভাবে মনে পড়িতেছে। মিথিলার উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভাগের যে প্রদেশ মহাভারতের সভাপর্ব্বে (সভা ৩০অ, ৩) গোপালকক্ষ নাম পাইয়াছিল, বায়ু এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণে যে প্রদেশ গোমন্ত বা গোবিন্দ জাতির আবাস বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিল (মার্কণ্ডেয় ৫৭অ; ৪৪; বায়ু ৪৫অ, ১২৩), সেই প্রদেশের এক সময়ের গৌড়নাম আমাদের সমগ্র বঙ্গভূমির অতি আদরের ও গৌরবের নাম। মৎস্যপুরাণকার বলেন (১২অ, ৩০) যে রাজা শ্রাবস্ত গৌড়দেশে শ্রাবস্তীনগর নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; গৌড়বহো কাব্যে পাই যে কবির সময়ের মগধের অধিপতি ঐ গৌড়দেশ এবং মগধের অধীশ্বর ছিলেন, এবং বঙ্গদেশ তখন সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ছিল (৪১৩, ৪১৭, ৪১৮ ও ৪১৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। এল্‌বেরুনি দেখিয়া গিয়াছিলেন যে কুরুরাজ্যের থানেশ্বর পর্য্যন্ত ভূভাগ গৌড়নামে অলঙ্কৃত ছিল। উত্তর-পশ্চিমদিকে সে গৌড়দেশের প্রসারের কথা দূরে থাকুক, কুশনদীর কচ্ছ-প্রদেশেও প্রাচীন গৌড় নাম প্রচলিত নাই। শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অতি সহজলভ্য গ্রন্থ পড়িয়া হয়ত বিদ্যালয়ের বালকেরাও শিখিয়াছেন যে যাঁহারা পাল রাজা নামে খ্যাত তাঁহারা মুখ্য ভাবে এই মগধাদিদেশেই বাস করিতেছিলেন, এবং উত্তর বঙ্গ ও অন্যান্য বিভাগ আপনাদের অধিকারভুক্ত করিয়া শাসন করিতেছিলেন। বাক্‌পতির সময়ের মত তখনও এই রাজাদের গৌরবের উপাধি ছিল গৌড়-মগধেশ্বর। নারায়ণ-পালের উত্তরাধিকারীরা যখন আদি গৌড় ও মগধ হারাইয়া বঙ্গের একটি উপবিভাগে আশ্রয় লইয়াছিলেন, তখন যে মিথিলা-মগধের জনস্রোত ও সভ্যতাস্রোত বিশেষভাবে বঙ্গদেশে প্রবাহিত হইতেছিল, এবং সমগ্র বিহার প্রদেশ, বাষ্ট্রকূট, গুর্জর প্রভৃতি পাশ্চাত্য ও মধ্য ভারতীয় জাতির বিশেষত্বে চিহ্নিত হইতেছিল, তাহা না বলিলেও বুঝিতে পারা যায়। বলীর বংশের অর্থাৎ দ্রবিড় জাতীয় পুণ্ড্র, সুহ্ম ও বঙ্গ নামে পরিচিত লোকেরা যে বহু পূর্ব্বকাল হইতে মগধের ভাষা, ধর্ম্ম ও রীতি নীতি অবলম্বন করিয়া বাড়িয়া উঠিতেছিল, চীন পরিব্রাজকদের বর্ণনায় তাহা অতি সুস্পষ্ট। মহীপাল যখন বরিন্দ ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন লাভ করিয়াছিলেন, তখন মহানন্দার পশ্চিমপারে পূর্ব্বপুরুষদের আদি ভূমিতে ক্ষমতা প্রসার করিতে ছাড়েন নাই; কিন্তু যাহা ভাঙ্গিয়াছিল তাহা গড়ে নাই। পাশ্চাত্য ও মধ্যদেশের প্রভুতায় বিহার পরিবর্ত্তিত হইল; দেশের লোক মাথায় উষ্ণীষ বাঁধিল, ভিন্ন অক্ষর লিখিয়া ভিন্ন ভাষা শিখিল, ভোজনের সামগ্রীতেও পরিবর্ত্তন ঘটাইল। আর সমগ্র বাঙ্গলায় মগধের সভ্যতা ও গৌড়ী রীতি সুরক্ষিত হইয়া নূতন বিকাশ লাভ করিল। বিকাশের ধারাবাহিকতা বিচার করিলে আমরাই আজ বঙ্গদেশে প্রাচীন মগধের সভ্যতার বড়ভাগের উত্তরাধিকারী এবং আজ এই বিহার-প্রবাসে প্রাচীন বিহারের পরিস্ফুট প্রতিনিধি। তাই পরিবর্ত্তিত বিহারের লোকেরা আজ আমাদিগকে চিনিতে পারিতেছে না, এবং আমরাও এই প্রাচীন লীলা ভূমিতে দেশবাসীর সাড়া না পাইয়া প্রাচীন-স্মৃতি বহন করিয়া বলিতেছি—"বাঁশরী বাজাতে গিয়ে বাঁশরী বাজিল কই।"

তবে এই উৎসবের নাটমন্দিরে যদি বিশ্বজনীন নূতন সুর ভাঁজিতে পারিতাম তাহা হইলে এ বাঁশরী আবার বাজিত; ভারতীর পূজার মণ্ডপে পুরোহিতেরা যদি বিশ্বজনীন নূতন মন্ত্র উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে হয়ত সকলেই এখানে পুষ্পাঞ্জলি দিতে আসিত। কেবল যে এ দেশের ইতিহাসের সঙ্গে বাঙ্গালার ইতিহাস গাঁথা পড়িয়াছে তাহা নয়, ভারতবর্ষের সেকাল একালের সকল প্রদেশের ও সকল জাতির ইতিহাসের সঙ্গে বাঙ্গলার ইতিহাসের অচ্ছেদ্য মিলন আছে তাহা ভুলিলে চলিবে না। প্রাদেশিক ক্ষুদ্রতায় যদি বঙ্গদেশকে স্বতন্ত্র করিয়া, তুলি, এবং ঐ দেশের মধ্যেই সকল প্রাচীনতা গুঁজিবার লোভে যদি কালিদাসকে নবদ্বীপে জন্ম লইতে বাধ্য

করিয়াছেন, এবং বিপুলায়তন ভারতবর্ষের একটি স্থানের বা "অরণ্য ঠানে রজ্জম্ মাপেস্সামি" বলিয়া নূতন রাজ্য গড়িয়াছেন, তখন প্রাচীন অবস্থার কিঞ্চিৎ আভাস পাই। অনেক বুভুক্ষু জাতি আসিয়া ভারতবর্ষে বাস করিবার প্রচুর স্থান পাইয়াছিল এবং ভারতবাসী হইয়া গিয়াছিল। সেকালের সকলেই হিদেন ছিল বলিয়া পরস্পরের মিলনে বাধা হয় নাই। পরে যখন অন্য জাতির লোকেরা আসিলেন, এবং নূতন রকমের ধর্ম্মবিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া বলিলেন যে তাঁহারা তাঁহাদের বিশেষত্বটুকু ষোল আনা বজায় রাখিবেন, তখনকার দ্বন্দ্বে ইয়োরোপীয় ধরণের ইতিহাস রচিত হইয়াছিল।

এ সম্পর্কে বাঙ্গলার ইতিহাসের একটা দৃষ্টান্ত দিব। যাঁহারা দ্রবিড় জাতীয়ের বঙ্গভূমিতে আর্য্য-সভ্যতা লইয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহারা দেশের লোকদিগকে আর্য্য-আদর্শ লইবার জন্য কোন প্রকার পীড়ন করেন নাই; দেশের লোক নূতনত্বের সৌন্দর্য্যে অথবা গৌরবে মুগ্ধ হইয়াই নূতন লোকদিগের মিত্র প্রতিবেশী হইয়াছিল, এবং গুণ এবং ক্ষমতা দেখিয়া নিজেদের কল্যাণের জন্যই নূতনকে শ্রেষ্ঠ পদবী দিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাবের পর ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্ম প্রসারের সময়েও কোনও উৎপীড়ন ঘটে নাই। ব্রাহ্মণদের নামে যতই দুর্নাম থাকুক, তাঁহারা যাচিয়া যাচিয়া উচ্চশ্রেণীর দ্রবিড় জাতীয়-দিগকে ধর্ম্ম কর্ম্মের জন্য পুরোহিত দিয়াছিলেন, এবং শূদ্রবর্গের প্রসার বাড়াইয়া দিয়া শূদ্রের নবশাখার সৃষ্টি করিয়াছিলেন। দ্রবিড়েরাও যাহাদিগকে অতি নীচ বলিয়া স্পর্শ করিত না, তাহাদিগকে ইহারাও স্পর্শ করেন নাই, অথবা দ্রবিড়ের কাছেও মান মর্য্যাদা রাখিতে হইলে স্পর্শ করিতে পারিতেন না। এরূপ স্থলে বাঙ্গালায় আর্য্য আগমনের কোন্ গৌরবের কথা সোৎসাহে ও সাগ্রহে পড়িবার মত ছিল যে সেই কথা লইয়া সেই সময়ের ইয়োরোপীয় ছাঁচের ইতিহাস রচিত হইবে? যত জ্ঞাতব্য বা শিক্ষাপ্রদ হউক না কেন, যাহাতে রক্ত গরম করিবার মত উদ্দীপনা নাই, তাহাকে কেহ যেন ইতিহাসই বলিতে চাহেন না। এ ভ্রান্তি না গেলে আমাদের ইতিহাস রচিত হইবে না। ভ্রান্তি যে ঘুচিতেছে, ইতিহাসের যথার্থ উপকরণ যে চিহ্নিত হইতেছে, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছি; কাজেই আশায় ও আনন্দে বলিতে পারি যে আমাদের ইতিহাসের বিপুল ও সুন্দর মন্দির গড়িয়া উঠিবে, এবং সকল ভারবাহীর পরিশ্রম সফল হইবে।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

তীর্থ লীলা।

লুকিয়ে যেতে চাও হে সখা
ছিছি পরাণ বঁধু!
হৃদয়-শতদলে আমার
ফুরিয়েছে কি মধু?
নাই কি আশা-কুঞ্জে ঘেরা গুপ্ত বৃন্দাবন;
বনের মাঝে ফুলের হাসি অলির গুঞ্জরণ!
আজো শ্যামল দুর্ব্বাদলে ধেনু তোমার গোষ্ঠে চলে
তমাল তলে দুল্‌ছে দোলা
বঁধু!
হৃদয়-শতদলে আমার
ফুরিয়েছে কি মধু!

(২)

কূল হারা নয়ন ধারা
উজান ব'য়ে যায়!
তরি তোমার বাইবে নাকি
প্রেমের যমুনায়?
চিন্তাকাশে তারার মালা, চাঁদের চন্দ্রহার
ভুবন ভরা আলোর মেলা নাইকো অন্ধকার
প্রাণের সুরে আমারহিয়া উঠছে আজো ঝঙ্কারিয়া
বাঁশি তোমার বাজাও, এসে
বঁধু!
হৃদয়-শতদলে আমার
ফুরিয়েছে কি মধু?
এস আমার রাখাল-রাজা
গিরি গোবর্দ্ধনে,
সোহাগ জলে উজল করা
সোনার সিংহাসনে।
সরম-সরু-সুতায় গাঁথা মায়ার রত্ন-হার
পড়িয়ে দিব তোমায় সখা আমার অহংকার,
সাজিয়ে ষোড়শ উপচার হয় নি দেওয়া উপহার
জীবন দিয়ে মরণ দিয়ে
বঁধু!
হৃদয়-শতদলে আমার
ফুরিয়েছে কি মধু!

শ্রীবিজয়াকান্ত লাহিড়ী।

যখন মিশনারি সম্প্রদায় এদেশে দেশীয় শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য বিপুল উদ্যমে কার্য্য করিতেছিলেন, তখন এদেশীয় শিক্ষিত লোক তাহাতে বড় সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছিলেন না। তাঁহাদের অনেকেই দেশে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোচনা ও অধ্যাপনার জন্য উচ্চ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পক্ষপাতী ছিলেন। রামমোহন রায় ছিলেন এই দলের অগ্রণী।

১৮১৪ অব্দে জয়নারায়ণ ঘোষাল নামক এক ধনবান্ বাঙ্গালী হিন্দু, মৃত্যুকালে এদেশে ইংরাজী শিক্ষা বিস্তার জন্য ২০ বিশ হাজার টাকা দান করিয়া গেলে, ইংরেজ বাঙ্গালী অনেকেরই মনে ইংরেজী শিক্ষা প্রচলনে অগ্রসর হইবার ইচ্ছা জাগ্রত হইতে থাকে। এই সময় কলিকাতার ঘড়ি নির্ম্মিতা ডেভিড হেয়ারও একটী ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপন করিবার উদ্যোক্তা হইয়া রামমোহন রায় প্রভৃতির সহিত পরামর্শ করেন। রামমোহন রায় তাঁহাকে এ বিষয়ে উৎসাহিত করিলে তিনি কলিকাতার অন্যান্য সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত এ বিষয় আলোচনা করেন। অতঃপর ১৮১৬ অব্দে (মতান্তরে ১৮১৭ ২০শে জানুয়ারী) সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি Sir Edward Hyde East, লেপটেনেণ্ট আর্ভিন, রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির সহায়তায় হেয়ার সাহেব হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। হিন্দু কলেজে ইংরেজী বাঙ্গালা উভয় ভাষাই শিক্ষা দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়।

মিশনারিদিগের চেষ্টায় ও যত্নে কতকগুলি বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইল; কিন্তু তখনও বালকদিগের পাঠের উপযুক্ত পুস্তকের অভাব রহিয়া গেল। এই সময় পর্য্যন্ত যে সকল পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছিল—বত্রিশ সিংহাসন, হিতোপদেশ, প্রতাপাদিত্য চরিত্র, ইসপের গল্প, রাজাবলী প্রভৃতি—এগুলি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের ছাত্রদিগের উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছিল। সুতরাং এখন বালকদিগের উপযোগী করিয়া ধারাপাত, জমিদারী হিসাব, ভূগোল, প্রভৃতি লিখিত ও মুদ্রিত হইল। এবং এই পুস্তকগুলির সঙ্গে বাইবেলের মুদ্রিত উপদেশও বালকগণের পাঠ্যরূপে নির্দ্ধারিত হইল।

কলিকাতায় ও কলিকাতার নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহে এইরূপ ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইতে থাকিলেও দেশের আভ্যন্তরীণ পল্লিসমূহে তখনও এই ব্যবস্থা অচিন্তনীয় ছিল। এই সময় পল্লিগ্রামে অবস্থাপন্ন গৃহস্থের গৃহে পার্শিভাষা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা ছিল। এইরূপ কোন একটী স্থানে হিন্দু ও মুশলমান পল্লি-বালকেরা সমবেত হইয়া পার্শি 'হরপ' লিখিত ও পার্শি 'বয়াত' মুখস্থ পাঠ করিত। স্থানে স্থানে পার্শি ও বাঙ্গালা উভয় বিষয়েই লিখান ও পড়ান হইত।

এডাম সাহেব এই সময়ের পল্লি-শিক্ষা ব্যবস্থার যে চিত্র প্রদান করিয়াছেন তাহা এইরূপ :—

পল্লিগ্রামে বালকদিগকে পড়ান অপেক্ষা লিখানতেই অধিক সময় দেওয়া হইত। লিখাইবার নিয়ম ছিল চারি প্রকার। (১) মাটীতে অক্ষর আঁকিয়া তাহার উপর মক্স-করান; এইরূপে এক একটী অক্ষর করিয়া মাটিতে লিখিয়া শিক্ষা হইলে (২) অক্ষরগুলি তাল পাতায় দাগিয়া দিতে হইবে, বালক তাহার উপর খাগের কলম দ্বারা পুনঃ পুনঃ মক্স করিবে। এইরূপে বালকের অক্ষর জ্ঞান হইলে (৩) বালককে নিজে নিজে কলার পাতে লিখিতে দিতে হইবে। (৪) অতঃপর দেশী কাগজে লিখা।

বাঙ্গালা লিখার বিষয় ছিল—স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, এক-দুই, কড়াকিয়া, বুড়িকিয়া ইত্যাদি। মুখে মুখে শিক্ষার বিষয় ছিল—শুভঙ্করের আর্য্যা, এবং তৎসংক্রান্ত মানসিক গণনা। পাঠের বিষয় ছিল—সরস্বতী বন্দনা ও চাণক্য শ্লোক। একজন অপেক্ষাকৃত বয়স্থ বালক সম্মুখে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া জোড় হস্তে সরস্বতী-বন্দনা আবৃত্তি করিত, তাহার পশ্চাতে ঐরূপ ভাবে বসিয়া অন্যান্য বালকগণ সেই পাঠ তাহার সঙ্গে সঙ্গে সমস্বরে পাঠ করিত। তার পর দাঁড়াইয়া চাণক্য শ্লোক সমস্বরে মুখস্থ বলিত। ইহাই ছিল সেকালের পল্লিগ্রামের লেখা পড়া শিক্ষার রীতি।

মিশনারিগণ প্রথম প্রথম তাঁহাদের স্কুল সমূহেও এই রীতিই প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন; ক্রমে পাঠ্য পুস্তক মুদ্রিত হইলে, সেই দেশীয় রীতির সঙ্গে সঙ্গে নিম্ন লিখিত ছাপার পুঁথি গুলিও বালকদিগের পাঠের জন্য নির্দ্ধারিত হয়।

জমিদারী হিসাব——স্মিথ সাহেব কৃত।

মহাসভায় লিখিয়া পাঠাইলেন। ১৮৩৫ অব্দে মহাসভা শিক্ষিত দেশীয় অধিবাসীদিগের সহিত এক যোগে মিলিত হইয়া দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্র ইংরেজী শিক্ষাবিস্তার করিবার উপদেশ প্রদান করিলে গবর্ণর জেনারেল লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিঙ্ক মিঃ ট্রেভিলিয়ানকে এই শিক্ষা সমস্যা মীমাংসার জন্য নিযুক্ত করেন।

দেশীয় শিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষা লইয়া দলাদলি যখন ঘনীভূত হইয়া উঠিতেছিল, সেই সময় কলিকাতায় মহাবিদ্যালয় বা হিন্দু কলেজ স্থাপিত হয়। ইতিমধ্যে সেই মহাকলেজের বহু ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়া আসিয়া কলিকাতার অবস্থাপন্ন লোক ও মিশনারিদিগের দ্বারা আরও কয়েকটী ইংরেজী স্কুল স্থাপন করাইয়াছিলন; তাহাতেও ছাত্র সংখ্যা প্রচুর হইয়াছিল। শ্রীরামপুরের মিশনারিরাও এই সময় একটী কলেজ স্থাপন করিয়াছিলেন সুতরাং এই সময় কলিকাতায় ইংরেজী শিক্ষার সমর্থনকারী দেশীয় লোকের অভাব ছিল না।

যথা সময়ে সুপ্রিম কাউন্সিলে এই শিক্ষা সমস্যার শেষ মীমাংসা হইয়া যায়। লর্ড উইলিয়াম বেণ্টিঙ্ক, সার চার্লস মেটকাফ্ ও মিঃ মেকলে দেশে ইংরেজী শিক্ষা বিস্তারের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া শিক্ষা সমিতিকে (General Committee of Public Instruction) তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে আদেশ করেন। এবং প্রাচীন মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগের ভবিষ্যৎ নূতন বৃত্তি বন্ধ করিয়া দেন।

এই আদেশ অনুসারে দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রে নিম্নলিখিত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় গুলি স্থাপিত হইয়া গেল।

ঢাকা কলেজ—	১৮৩৫
পুরী কলেজ—	১৮৩৫
মেদিনীপুর কলেজ—	১৮৩৫
গৌহাটী কলেজ—	১৮৩৫
পাটনা কলেজ—	১৮৩৫
ভাগলপুর কলেজ—	১৮২৩
ঐ ইনিষ্টিটিউসন—	১৮৩৭
কলিকাতা মেডিকেল কলেজ—	১৮৩৫
হুগলী মহম্মদ মহসিন কলেজ—	১৮৩৬
বোয়ালিয়া কলেজ—	১৮৩৬
কুমিল্লা কলেজ ২০শে জুলাই—	১৮৩৭
চট্টগ্রাম কলেজ (জানুয়ায়ী)—	১৮৩৭
যশোহর স্কুল (জুন)—	১৮৩৮
দিনাজপুর স্কুল (২৭ জুন)—	১৮৩৮

কলিকাতায় ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে ইংরেজী শিক্ষার সমর্থনকারী লোকের অভাব না থাকিলেও সুদূর মফস্বলে তখন পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থনকারী দূরে থাকুক, কোন শিক্ষারই সংস্কার-সমর্থনকারী লোক বড় অধিক ছিলেন না। তাহার কারণ জীবন সংগ্রাম রাজধানীর সংশ্রবে তথায় ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল; কিন্তু রাজধানী হইতে সুদূরবর্ত্তী পল্লিগ্রামের হিন্দু মুসলমান ভদ্রসমাজ তখনও জমিদারী মহাজনী শিক্ষা অপেক্ষা অধিক শিক্ষার আবশ্যকতা অন্তরের সহিত অনুভব করিতেন না। তাঁহারা ক্ষেতের ধান, গরুর দুধ ও পুকুরের মাছ খাইয়া এবং শুভঙ্করের নিয়ম অনুসারে বুঝ-প্রবোধ করিয়া নিশ্চিন্তে দিনপাত করিতেন, শিক্ষার হেরেফেরে জাত খোয়ান অপেক্ষা স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়া মূর্খ থাকা সহস্র গুণে শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন। সুতরাং দেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে এই সকল বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হইলে, তাহা যে দেশীয় লোকেরা খুব কৃতজ্ঞতার সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা নয়।

গবর্ণর জেনারেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক যখন শিক্ষা সংস্কারের বিষয় লইয়া এইরূপ চিন্তা করিতেছিলেন, এবং তাঁহার চিন্তার ফলে যখন ইংরেজী শিক্ষার স্রোত বাঙ্গালার কেন্দ্রে কেন্দ্রে ঢেউ তুলিয়া প্রবাহিত হইতেছিল, সেই সংস্কারের যুগেও বাঙ্গালার আভ্যন্তরীণ পল্লিসমূহে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার পাঠ—সেই "সরস্বতী বন্দনা" ও "চাণক্য শ্লোকে"ই আবদ্ধ রহিয়াছিল। পল্লিগ্রাম সমূহে শিক্ষার এই শোচনীয় অবস্থা লক্ষ্য করিয়া মিঃ এডাম (W. Adam) বাঙ্গালাদেশে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা উন্নত প্রণালীতে প্রবর্ত্তন জন্য লর্ড বেণ্টিঙ্ককে অনুরোধ করেন। লর্ড বেণ্টিঙ্ক মিঃ এডামকে তাহার এ প্রস্তাব যথারীতি আলোচনার জন্য লিখিয়া উপস্থিত করিতে

আমি উহা দর্শন করিতে যাত্রা করি। পথি মধ্যে আত্মরক্ষার অভিপ্রায়ে আমরা প্রত্যেকে একটা করিয়া রিভলভার গোপনে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলাম।

বেলা ১১টার সময় আমরা গ্রাম ত্যাগ করিলাম। প্রায় ৪৫ মাইল জঙ্গলের ভিতর দিয়া গমন করিয়া এক ক্ষুদ্র পাহাড়ের পাদমূলে উপস্থিত হইলাম। ঐখানে ঝোপের মধ্যে একখানা বড় পাথর ছিল, কি কৌশলে ঠিক বুঝিতে পারিলাম না, প্রধান পুরোহিত ঐ পাথর খানা সরাইয়া ফেলিলেন। দেখিলাম, মৃত্তিকার মধ্যে সিঁড়ি নামিয়া গিয়াছে। আমরা উহার মধ্যে প্রবেশ করিলে পাথর খানা আবার সরাইয়া দেওয়া হইল। সমস্ত পথ ঘোর অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইয়াগেল। তখন পুরোহিত একটা আলো জ্বালিয়া দিলেন। উহার ক্ষীণ আলোকের সাহায্যে আমরা অতি সন্তর্পণে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। খানিক দূর গমনের পর আমরা পুনরায় সূর্য্যালোকে উপস্থিত হইলাম। তখন আমাদের পথের দুইদিকে উচ্চ পাহাড়ের মধ্যস্থলে খুব সঙ্কীর্ণ পথ।

খানিক দূর গিয়া আমরা একটী ছোট স্রোতস্বিনী দেখিতে পাইলাম। উহার দক্ষিণ কিনারা দিয়া প্রায় এক মাইল গমনের পর আমরা এক নাতি বিস্তৃত হ্রদ দেখিতে পাইলাম। সহসা দেখিলে মনে হয় ইহা যেন একটি কূপের মধ্যে অবস্থিত। তাহার কারণ এই যে, যে সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া আমরা ঐ স্থানে উপস্থিত হইলাম, সেদিক ছাড়া ঐ হ্রদের চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বতের প্রাকার। উহার জল খুব গভীর বলিয়া মনে হইল। পুরোহিত বলিলেন মধ্যস্থলে উহার গভীরতা প্রায় ৬০।৭০ হাত। জলের মধ্যে বড় বড় কমল ফুটিয়া রহিয়াছে। সমস্ত হ্রদটা নানাপ্রকার মৎস্যে পরিপূর্ণ। উহাদিগকে কেহ হিংসা করে না বলিয়া উহারা আমাদের হস্ত হইতে খাদ্য দ্রব্য বিনা সঙ্কোচে গ্রহণ করিতে লাগিল।

ইহার গভীর অংশে বহুতর জল সর্প বাস করে। দেখিলাম, হ্রদের একদিকে ঠিক জলের উপর একটা প্রকাণ্ড অজগর সর্প কুণ্ডলি পাকাইয়া শয়ন করিয়া আছে। আমরা যখন ঐ স্থানে উপস্থিত হইলাম, তখন সে একবার মাথা তুলিয়া আমাদিগকে দেখিল, তাহার পর আবার শয়ন করিল। অনুমানে বোধ হইল সর্পরাজ দৈর্ঘ্যে ৩০ হাতের কম হইবে না। শুনিলাম, হ্রদের মৎস্যাদি খাইয়াই ইহা জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

হ্রদের আর একদিকে দেখিলাম, ঐ প্রকার আর একটা পাথরের উপর এক বৃহৎ চিতাবাঘ শয়ন করিয়া আছে। সেও একবার আমাদের দিকে চাহিয়া দেখিয়াছিল। পুরোহিত বলিলেন যে এটাই হ্রদের রক্ষক। যদি কোও অনধিকারী লোক এই স্থানে উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহারা তাহার প্রাণনাশ করে কিন্তু যাহাদের আসিবার অধিকার আছে, তাহাদিগকে কিছু করে না।

যে স্থানে আমরা দাঁড়াইয়াছিলাম উহার এক পার্শ্বে একটী ক্ষুদ্র গোলাকার মধ্যস্থলে ছিদ্র করা প্রস্তর খণ্ড রক্ষিত ছিল। উহা সিঁদুর ও নানাপ্রকার পুষ্পমণ্ডিত। শুনিলাম, ইহার নাম "ঈসুমা" অথবা জীবনের বা জননীর মুখ। এতক্ষণ বলি নাই, এই হ্রদের নাম "জীবনের হ্রদ"। কেন ইহার এমন নাম হইল, তাহা পরে বলিতেছি।

এই অঞ্চলের লোকদের নিয়ম, বিবাহের ঠিক পরে বর ও কন্যাকে পুরোহিত মহাশয়ের সহিত এই হ্রদে আসিয়া এই গোলাকার পাথরের সম্মুখে জোড়হস্তে দাঁড়াইতে হয়। তাহার পর উহারা প্রার্থনা করে যেন উহাদের দুইটী পুত্র ও দুইটি কন্যা জন্মে। এইখানে বলিয়া রাখা ভাল যে, এই অসভ্য জাতিদিগের মধ্যে রমণীর পুত্র না হওয়া এক বিষম দুর্ঘটনার ও বিপদের কথা। সকলে স্থির করে যে, ঐ স্ত্রীলোকের উপর হয় দেবতার কোপ পড়িয়াছে, নতুবা কোনও অপদেবতা উহাকে আশ্রয় করিয়াছে। সেইজন্য ঐ হতভাগিনীকে গোপনে কেহ বিষপ্রয়োগে হত্যা করে না। প্রসঙ্গক্রমে এইস্থানে আর একটি প্রথার কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। আফ্রিকার অনেক জায়গায় দেখিয়াছি, পুত্রবধুর উপর শাশুড়ির অপ্রতিহত ক্ষমতা। শাশুড়ির অবাধ্য হওয়া এদেশে অত্যন্ত ভীষণ অপরাধ। ইহার জন্য শাশুড়ি বধূকে যে ভাবে ইচ্ছা সাজা দিতে পারে, এমন কি ইহার জন্য যদি সে বধূকে হত্যাও করিয়া ফেলে তাহার জন্য সমাজের কেহ একটি কথাও বলিবে না।

কখন ২ শাশুড়ি বধূর উপর কুপিত হইয়া তাহাকে অপুত্রক হইবার অভিশাপ দেয়। এদেশে রমণীর পক্ষ

ইহার তুল্য অভিশাপ আর নাই। এই প্রকার ঘটনা উপস্থিত হইলে স্বামী-স্ত্রী পুরোহিতকে সঙ্গে লইয়া এই হ্রদে উপস্থিত হয় ও দেবীর নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া সন্তান প্রার্থনা করে। কিন্তু দেবীর সন্তোষের জন্য ছাগ, মুরগী প্রভৃতি বলি না দিলে দেবী তাহাদের উপর প্রসন্ন হন না। বলির পর পুরোহিত হ্রদ হইতে খানিকটা জল লইয়া রমণীর অর্দ্ধাঙ্গে ছড়াইয়া দেন। আমাদের দেশের ষষ্ঠী পূজার পর ঠিক যেন শান্তি বারি সেচন।

এইখানে বলিয়া রাখি যে, পূজা প্রদানের পর যদি সন্তানের মুখ দেখে, তাহা হইলে উহার মস্তকের প্রথম চুল কাটিয়া আনিয়া দেবীকে উপহার দিয়া থাকে। আমাদের দেশেও দেব দেবীকে সন্তানের চুল দিবার প্রথা আছে। এই সমস্ত ব্যাপারে আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য দেখিয়া আমি ও রতিকান্ত দুইজনেই অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। রতিকান্ত আমাকে বলিল যে, তাহাদের দেশে (বঙ্গ দেশে) ষষ্ঠীদেবীর সহিত এই হ্রদের ঈসুমার অত্যন্ত সাদৃশ্য আছে। বঙ্গদেশের অধিকাংশ রমণী সন্তান হইবার জন্য এবং সন্তান হইলে তাহার মঙ্গল কামনায় ষষ্ঠীদেবীকে বিবিধ প্রকারে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করেন। এদেশের রমণীরাও ঠিক ঐ অভিপ্রায়ে ঈসুমার পূজা করিয়া থাকে।

ইহার পর আমরা ফিরিয়া আসিলাম। ফিরিবার সময় পুরোহিত মহাশয়ের নিকট এই হ্রদ ও দেবীর উক্তির সম্বন্ধে যে কাহিনী শুনিলাম তাহা এই :—

অনেক শত বৎসর পূর্ব্বে একবার আম্বাসী অবুমো। (এই শব্দের প্রকৃত অর্থ 'বজ্রধারী দেবতা' অর্থাৎ ইন্দ্র) আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে এইস্থানে আহ্বান করিয়া এই হ্রদ ও প্রস্তর খণ্ড দেখাইয়া দিয়া কহিলেন "এইস্থান তোমাদের সন্তানদের রক্ষার জন্য আমি করিয়াছি। এখানকার দেবীকে সন্তুষ্ট করিতে পারিলে তোমাদের বংশ অক্ষয় হইবে এবং তাহার কেহ কোনও অনিষ্ট করিতে পারিবে না। আমাকে যদি তোমরা সন্তুষ্ট করিতে চাও, তবে প্রথমে এই দেবীকে পূজা করিবে। এই হ্রদে যে মৎস্য দেখিতেছ ইহারা তোমাদের জীবন। যতদিন ইহারা থাকিবে ততদিন তোমাদের বংশ ক্ষয় পাইবে না। এইজন্য ইহাদিগকে কখনও নষ্ট করিও না।"

আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি কয়েকজন বিশিষ্ট লোকব্যতীত ইহার অস্তিত্বের কথা কেহই জানে না। এখানে যাহারা পূজা দিতে আসে, তাহাদিগকে চক্ষু বন্ধ করিয়া আনা হয়। এখানে আসিবার পথ, হ্রদ প্রভৃতি তাহারা কিছুই দেখিতে পায় না।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

মহাপুরুষদের মৃত্যু।

মহম্মদের মরণে ব্যথিত জনমণ্ডলীকে সম্বোধন করিয়া পরমভক্ত আবুবকর বলিয়াছিলেন—'তোমরা কি কোরাণের সে কথা ভুলিয়াগিয়াছ—মহম্মদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাপুরুষগণ মৃত্যুর অধীন ছিলেন; মহম্মদ তোমাকেও একদিন দেহ-ত্যাগ করিতে হইবে!" মরণটা এমন একটা নিত্য অপরিহার্য্য ধ্রুব জিনিষ হইলেও মানুষ ঠিক সাম্‌না সাম্‌নি ভাবে তাহার সহিত আলাপ ব্যবহার করিতে পছন্দ করে না; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহাকে প্রতি মুহূর্ত্তে এই নিত্য সঙ্গীর সহিত আদান প্রদান না করিয়া চলিবার উপায় নাই। মৃত্যুর নামটা পর্য্যন্ত গোলায়েম করিয়া মিঠ'লো ভাষায় উচ্চারণ করা হইয়া থাকে। শাস্ত্রকারেরা শত মুখে বলিতেছেন মরণকে ভয় করিও না।

মৃত্যোর্বিভেসি কিংবাল।
ন স ভীতো বিমুঞ্চতি।
অদ্য বাব্দ শতান্তে বা
মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ।

মরণের পরপারে ধ্রুবলোক, চন্দ্রলোক, ইন্দ্রলোক ও সূর্য্যাদি লোক শত সুখের হাট বসাইয়া বসিয়া আছে। মরণের পারে এমন উদ্যান মানুষের জন্য আছে, যাহার উর্ব্বর শস্য শ্যামল বক্ষঃ দিয়া মৃদু গামিনী কল্লোলিনী সুধা স্রোত ঢালিয়া বহিয়া যাইতেছে। সেখানে যে সুখ তাহার তুলনায় এ মর্ত্ত্য সুখ অতি নগণ্য অতি মাত্র নশ্বর। মৃত্যুকে কোন ক্রমে অতিক্রম করিতে পারিলেই মানুষ এমন দেশে যাইবে, যেখানে জ্বালা নাই, যন্ত্রণা নাই। প্রিয়জনের বিচ্ছেদ

প্রতিশোধ।

(১)

জয়পুরের যোগেশ চৌধুরীর মত প্রবল প্রতাপ ও অত্যাচারী জমিদার তখন সে অঞ্চলে কেহই ছিল না। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট হইতেও নাকি তাঁহার প্রতাপ ছিল বেশী এবং জনসাধারণ এমনও বিশ্বাস করিত যে দুই দশটা খুন হজম করার হেকমত যোগেশ বাবুর আছে। সুতরাং তাঁহাকে সকলেই খুব ভয় করিয়া চলিত।

এতটা নাম ডাক থাকিলেও যোগেশ বাবু কোনও দিন কাহারো উপর জুলুম জবরদস্তি করিয়াছেন, এ কথার প্রমাণ কেহ দিতে পারে নাই। তথাপি তাঁহার নামে বাঘে গরুতে এক ঘাটে জল খাইত; যোগেশ বাবুর পিয়াদা দেখিলে দুই দশ মাইলের মধ্যে কেহ মাথা না নোয়াইয়া পারিত না।

যোগেশ বাবুর বাড়ীতে বার মাসে তের পার্ব্বন ছিল। দোল, দুর্গোৎসবে, রাসযাত্রায় ও তাঁহার মাতা পিতার শ্রাদ্ধে বিস্তৃত আঙ্গিনা ও পুকুরের প্রকাণ্ড আয়ত পাড়ে বসিয়া হাজার হাজার লোক আহার করিত। স্বয়ং কর্ত্তা ছোট বড় সকলকে বিনয়ে ও মিষ্টি কথায় তুষ্ট করিতেন। কাহার কি দরকার, কে খায় নাই, কে আসে নাই—স্বয়ং তিনি সে সকল তত্ত্ব লইতেন। যে ভোলা চক্ষ 'কর্ত্তা মহারাজের' নাম শুনিলে অজ্ঞাতসারে আপন মাথায় হাত দিয়া তাহার অস্তিত্বের সন্দেহ মীমাংসা করিত, তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া আজ যখন যোগেশ বাবু কহিলেন, "হাঁরে ভোলা আর কিছু চাই না?"

ভোলা সম্প্রতি দিস্তা পাঁচেক লুচি, একটী পাঁঠার ঝোল আনা মাংস, দধি, ক্ষীর, মিঠাই, প্রভৃতি উদরস্থ করিয়াছিল। কর্ত্তার আদরে সে পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল "আজ্ঞে—হয় কর্‌তা মহারাজ, আর পাঁচ ছয় সের মাল কোন্ না সাম্‌লান যায়।"

(২)

যোগেশ বাবুর একমাত্র পুত্রের অন্নপ্রাশন। এই উপলক্ষে একটা বিরাট ধুমধাম হইতেছিল। কাণ্ড কারখানা দেখিয়া সে অঞ্চলের লোকের তাক্ লাগিয়া গিয়াছিল। খরচের পরিমাণ লইয়া স্থানে স্থানে মহা তর্ক বিতর্ক; দুই এক স্থলে মত বিরোধের ফলে হাতাহাতির আশঙ্কা না হইয়াছিল এমন নহে।

মাথায় পাগড়ী, গায়ে পাতলা মেরজাই, বাম হাতে হরিদ্রা রঞ্জিত গামছা লইয়া যোগেশ বাবু খালি পায়ে চারি দিকে তত্ত্ব-তারাস করিতেছেন। ছোট বড় সকলকেই হাসি মুখে অভ্যর্থনা করিতেছেন। যাহারা তাঁহাকে বাঘের চেয়েও বেশী ভয় করিত, প্রয়োজনে বা অপ্রয়োজনে পথ চলিতে তাঁহার সম্মুখে পড়িলে যাহারা পূর্ব্ব জন্মের কোনো গুরুতর পাপের কথা স্মরণ করিত,—আজ উৎসব উপলক্ষে যোগেশ বাবু তাহাদের পিঠ চাপড়াইয়া দিতেছেন। তাহারা হাতে যেন স্বর্গ ধরিতে পাইতেছে। আজ তাঁহার সম্মুখে কেহবা নৃত্য করিতেছে, কেহ 'মরি হায় হায় রে' বলিয়া মহড়ায় গান ধরিতেছে; কোনো খানে বা একদল বহুবা স্ফোটন পূর্ব্বক কুস্তি লড়িতেছে! আজ মহোৎসব—সকলের হৃদয়ে আনন্দের বন্যা!

(৩)

রাত্রি দেড় প্রহরের সময় এই বিরাট কোলাহল থামিয়া গেল। যোগেশ বাবু উপরের বারান্দায় মেঝের উপর বসিয়া ওঃ আঃ প্রভৃতি দুই একটী আয়েস সূচক ধ্বনি করিতে করিতে পা ছড়াইয়া বসিলেন। ধনু নদীর শীতল বাতাসে তাঁহার কর্ম্ম ক্লান্ত দেহ ধীরে ধীরে সুস্থ হইতে লাগিল।

খানিক পরে বিন্ধিকে ডাকিয়া কহিলেন "দেখ্‌তো বিন্দি নয়াবৌ কৈ?—ডাক্‌ত।" বিন্দি ঘুরিয়া আসিয়া জানাইল 'মাকে ত দেখ্‌লাম না।' "দেখ্‌লি না কেমন? এখন ত আর বাড়ীতে ভিড় নাই—খোকা কোথায়?"

"খোকা মাসীমার বুকে—ঘুমে" বিন্দি আবার চলিয়া গেল। আবার আসিয়া জানাইল 'মাকে পাওয়া গেল না।'

বিরক্ত হইয়া যোগেশ বাবু কহিলেন, তোদের কর্ত্তা মা কি করেন?

কর্ত্তা মা অর্থে যোগেশ বাবুর বড় ভাই রমেশের অপত্য-হীনা বিধবা পত্নী। তাঁহারই হাতে এত বড় সংসারটার পাঁজিপুঁথি ছিল। ইনিই যোগেশ বাবুর পাংয়িত্রী, ইনিই সব। বিন্ধি তাঁহাকে ডাকিতে গেল।

কারণ জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমরা ষ্টিমারের কর্ম্মচারীর নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এখানে বিলাতি ডাক লওয়া হইবে, কারণ কলিকাতা হইতে তাহা না নিয়াই ষ্টিমার ছাড়িয়াছিল। মেল বেগ তুলিতে ২টা বাজিয়া গেল, সুতরাং সে দিন ষ্টিমার সমুদ্রে পড়িতে পারিবে না বলিয়া সমস্ত রাত্রিই এখানে রহিল।

পরদিন বেলা ৮ টার সময় ডায়মণ্ড হারবার হইতে জাহাজ ছাড়িল। এখান হইতেই গঙ্গা ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া বঙ্গোপসাগরকে আলিঙ্গন করিতে চলিয়াছে। বেলা ১০ টার সময় গঙ্গাসাগরের আলোকস্তম্ভ অতিক্রম করিয়া সাগরে পড়িলাম। সাগরের হরিদ্বর্ণ জল ক্রমশঃ গাঢ়তর হইয়া নীলবর্ণে পরিণত হইতে লাগিল এবং নীলবর্ণ জল ক্রমে কালজলে পরিণত হইল। যখন পর্য্যন্ত নীলজল আমাদের দৃষ্টির অন্তরালে যায় নাই তখন পর্য্যন্ত গাঙ্গচিল (seagull) দুই একটী আমাদের নয়নপথে পতিত হইতেছিল। কালজলে দুই একটী উড্ডীয়মান মৎস্য (flying fish) ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলাম না। কেবল অনন্ত সাগর নীলিমায় সমাচ্ছন্ন বিশাল গগনমণ্ডল, যেন অনন্তে অনন্ত মিলিয়াছে; এদৃশ্য অতিশয় মনোহর। ইতি মধ্যে কএকখানা মালের জাহাজ আমাদের এপাশ ওপাশ দিয়া চলিয়া গেল। শীতকাল বলিয়া কেহই সমুদ্র পীড়ায় আক্রান্ত হন নাই। ক্রমে বেলা প্রায় অবসান হইয়া আসিল, সূর্য্যদেব পশ্চিম গগন হইতে সমুদ্রের অতলজলে ডুবিয়া গেলেন। তাহার পানে অনেকক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়াছিলাম, ক্রমে চারিদিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন হইয়া গেল, আকাশে একটী একটী করিয়া তারা ফুটিতে লাগিল। আমরা নীচে নামিয়া আসিয়া আহারাদি করিয়া শুইয়া পড়িলাম। এইরূপে আমাদের ৩ দিন কাটিয়া গেল।

১০ই ডিসেম্বর প্রভাতে বেসিনের পর্ব্বতশ্রেণী অতি মনোহর মেঘমালার ন্যায় আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইল। রাত্রি ৫ টার সময় আমাদের বেশ শীত লাগিতেছিল, উঠিয়া দেখিলাম ষ্টিমার অত্যন্ত ধীরেধীরে চলিতেছে এবং সহরতলীস্থিত মিলের আলো ইরাবতীর জলে প্রতিফলিত হইতেছে, দেখিয়াই মন আনন্দে নাচিয়া উঠিল, ষ্টিমারের আরোহীগণ সকলেই উঠিয়া পড়িলেন, খাড়ি হইতে ষ্টিমার ইরাবতীর মধ্যে প্রবেশ করিল। ক্রমে প্রভাত হইয়া আসিল, সকলেই জিনিষপত্র বিছানা ইত্যাদি গুছাইয়া লইলেন, নামিবার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া দাড়াইয়া সকলেই চারিদিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অবলোকন করিতে লাগিলেন।

ব্রহ্মদেশ ধানের জন্য চির বিখ্যাত, অগ্রহায়ণ মাস এখনও ধান কাটা হয় নাই। নদীর দুইধারে মাঠভরা ধান, মাঝে মাঝে এক-আধটী ফায়া (pagoda) দেখা যাইতেছে, দেখিতে দেখিতে ষ্টিমার রেঙ্গুনে পঁহুছিল। ষ্টিমারে তিনটি আরোহী কলেরায় আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল, তাই ডাক্তার আসিলেন, পুলিশ ডাক্তারের অনুসরণ করিল। তখন ষ্টিমার জেটিতে লাগান হয় নাই, ডাক্তার প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের চলন সই স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়া লইলেন। পুলিশ ইত্যবসরে নাম, ধাম ইত্যাদি লিখিয়া লইলেন, ডেকের যাত্রীদিগকে নীচে নামিলে পরীক্ষা করা হইল। আমাদের জেটিতে নামিতে ১১টা বাজিয়া গেল, কাষ্টম অফিসার আসিয়া আবকারী বিভাগের জিনিষপত্র আছে কিনা পরীক্ষা করিয়া নিষ্কৃতি দিলেন, আমরাও হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম।

আমরা জেটি হইতেই এক বন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলাম। আহারাদি সমাপন করিয়া নগর পরিদর্শন করিবার জন্য বাহির হইলাম। রেঙ্গুনের পথগুলি প্রশস্ত ও সরল এমন কি কলিকাতার চৌরঙ্গী রাস্তার চেয়েও সুন্দর ও বিস্তৃত। গৃহ সমুদায় বৃহৎ সুগঠিত, দেওয়ালগুলি ইষ্টক নির্ম্মিত, প্রকোষ্ঠ ও ছাদ কাষ্ট রচিত। আমরা প্রথম কৃত্রিম হ্রদ (Royal Lake) দেখিতে গেলাম, হ্রদটী বড়ই মনোরম। ইহার মধ্যভাগে যাইবার জন্য পথ আছে, তথায় বহুসংখ্যক বিশ্রামাগার, ফুলের বাগান এবং হ্রদ মধ্যে নৌকা নিয়া বেড়াইবার জন্য নৌকার আড্ডা, আছে। বিকালে রেঙ্গুনের অধিবাসী বড়লোক প্রায় সকলেই হ্রদের পাড়ে বেড়াইতে যাইয়া থাকেন। হ্রদ দেখিয়া আমরা সোয়েডেগন (Shwedagan) ফায়া দেখিতে গেলাম। বড় ফায়াটী চতুর্দ্দিকে অসংখ্য ছোট ফায়াদ্বারা বেষ্টিত, তাহা ছাড়া অনাবৃত স্থান মর্ম্মর প্রস্তর বিনির্ম্মিত। ছোট ফায়াগুলিতে মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত ধ্যানস্থ ও শায়িত বুদ্ধ-মূর্ত্তি সকল বিরাজ

যেখানে উহা ডুব দিল, সেইখান হইতে আমাদের দক্ষিণে ৮।১০ হাত দূর পর্য্যন্ত স্থানের উপর তাঁহারা গুলি বৃষ্টি করিতে লাগিলেন। আমার বোধ হয় সেইজন্য উহা আর মস্তক উঠাইল না। যখন আমরা নদীর মাঝখানে, তখন বিদ্রোহীরা তীরের নিকটবর্ত্তী বৃক্ষ প্রভৃতির আড়ালে দাঁড়াইয়া আমাদের উপর গুলি চালাইতে লাগিল। আফ্রিকার অসভ্য লোকেরা প্রাচীন আমলের বন্দুক ব্যবহার করিতে ছিল বলিয়াই বোধ হয় সে যাত্রা আমরা রক্ষা পাইয়াছিলাম। যাহা হউক, তাহারা কিন্তু ২।৩ মিনিটের অধিক সময় বন্দুক চালাইবার অবসর পায় নাই। কারণ, আমাদের লোকেরা তাহাদের উপর এ ভাবে বন্দুক চালাইতে আরম্ভ করিল যে বিদ্রোহীরা অবিলম্বে শান্ত ভাব অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল।

তাহার পর আমরা দুইজনে বুকজলে উপস্থিত হইলাম। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়াই আমরা কয়েকখানা ডুবান নৌকা দেখিলাম। দুইজনে খুব খানিকক্ষণ ধস্তাধস্তির পর একখানা নৌকার ছিদ্রাদি বন্ধ করিয়া ভাসাইয়া দিলাম। তাহার পর আরও তিনখানাকে উদ্ধার করিলাম। চারিখানা নৌকা একসঙ্গে বাঁধিয়া আমরা দুইজনে উহার উপর চাপিয়া বসিলাম ও অপর পার হইতে টানিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সঙ্কেত করিলাম।

বিদ্রোহীরা কিন্তু আর থাকিতে পারিল না। এইবার তাহারা (বোধ হয় ১০০ লোক) দলবদ্ধ ভাবে তীরের দিকে দৌড়াইতে লাগিল ও আমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বন্দুক চালাইতে লাগিল। সাহেব কহিলেন, "নৌকার তলায় শুইয়া পড়।" বলা বাহুল্য ইহাতে উহাদের গুলি আমাদের কোনও অনিষ্ট করিতে পারিল না। আমি বিপদ কাটিয়া গেল ভাবিয়া মনে২ ভগবানকে ধন্যবাদ দিতেছি, এমন সময় সটাক্ করিয়া একটা শব্দ হইল এবং বোধ হইল যেন আমাদের গতি বন্ধ হইল আমি ব্যাপার খানা বুঝিতে না পারিয়া হে সাহেবকে কারণ জিজ্ঞাসা করিব এমন সময় তিনি বলিয়া উঠিলেন, "বন্ধু! আমাদের একখানা নৌকা বোধ হয় ভাঙ্গিয়া ডুবিয়া গিয়াছে। তুমি উঠিও না, আমি এখনি আসিতেছি"। এই বলিয়া সাহেব অদৃশ্য হইলেন এবং এক মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বস্থানে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার পর আমরা নিরাপদে ৩ খানা নৌকা লইয়া ফিরিয়া আসিলাম। বলা বাহুল্য একখানা নৌকা ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে সাহেব উহার বাঁধন কাটিয়া দিয়াছিলেন।"

যখন উহারা দুইজনে ফিরিয়া আসিল তখন দেখা গেল যে, হে সাহেবের একটা পা জখম হইয়াছে। যখন তিনি নৌকার বাঁধন কাটিয়া দিবার জন্য নৌকার তলা হইতে বাহিরে আসেন, ঐ সময়ে তিনি আহত হয়েন। কিন্তু লোকটার এমন সহ্য গুণ যে এ কথা তিনি রতিকে আদৌ বলেন নাই। এই বিদ্রোহ দমন হইবার পর এই অসম সাহসিক কাজের জন্য ইহাঁরা প্রত্যেকে একটা করিয়া মেডেল ও প্রথম শ্রেণীর সার্টিফিকেট পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। গভর্ণমেণ্ট রতিকে ফৌজে একবারে জমাদার করিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু সে পুলিশে যাইতে চাওয়াতে তাহাকে একবারে ইন্‌স্পেক্টার করিয়া দেওয়া হয়। সত্য কথা বলিতে কি, বাল্যকাল হইতে আমি বাঙ্গালা দেশের লোককে বড় ভীরু বলিয়া মনে করিতাম। আমার ধারণা ছিল যে, ইহারা লেক্‌চার দেওয়া ও পরীক্ষা পাশ করা ভিন্ন আর কোনও কাজ করিতে পারে না। কিন্তু রতির কাজ দেখিয়া আমাকে স্পষ্টই স্বীকার করিতে হইতেছে যে, সব দেশেই ভাল মন্দ দুই প্রকারের লোক থাকে। রতি কিন্তু আমায় প্রায়ই বলিত যে, তাহার দেশে এমন হাজার২ ছেলে আছে, যাহারা সুযোগ পাইলেই তাহার অপেক্ষা অনেক অধিক সাহসের কাজ করিতে পারে।

যাহা হউক, ইহার পর আমরা ১৫। ১৬ দিনের মধ্যে ঐ প্রদেশের বিদ্রোহ দমন করিয়া ফেলিলাম। মেস্‌স্ লেম্বার্টের কিন্তু কোনও সংবাদ পাওয়া গেল না। এইখানে একটি কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না। এই বিদ্রোহ দমন ব্যাপারে রতি অনেকবার বিলক্ষণ সাহসের কাজ করিয়াছিল। শেষে এমন হইয়াছিল যে, কাপ্তেন সাহেব রতিকে না লইয়া কোথাও যাইতেন না।

শ্রীঅতুলবিহারী গুপ্ত।

প্রয়োগ করা হয়, কিন্তু ফরাসী লেখকেরা অনেক সময় অতি গুরু বিষয়-নিয়াও এমন হাসি ঠাট্টা করিতে পারেন যে, ভাবিলে মনে হয়, তাঁহারা যেন কেবল বড় ঘরের মেয়েদের আলস্যের হাই নিবারণ করিবার জন্যই বই লেখেন। ভল্‌টেয়ার ঠাট্টা করেন নাই, এমন জিনিস বোধ হয় দুনিয়াতে নাই। তথাপি ভল্‌টেয়ারকে আমরা প্রশংসা করি, কারণ তাঁহার সংস্কারের উদ্দেশ্য সুষ্ট; শুধু ইয়ারকি করাই তাঁর উদ্দেশ্য নহে। তখনকার দিনে প্রচলিত কদাচারের উপর তিনি যে তীব্র কশাঘাত করিয়াছেন, সে কথা ইতিহাস অনেক কাল মনে রাখিবে। য়্যানাটোল ফ্রান্সের সেরূপ উদ্দেশ্য নাই, একথা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু তাহা তত স্পষ্ট কিনা সন্দেহ।

আর তিনি স্থানে অস্থানে অনাবশ্যক অশ্লীল চিত্র যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপেও অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার রুচির প্রশংসা করিতে আমাদের মোটেই ইচ্ছা হয় না। 'ফেরেস্তাদের বিদ্রোহ' (The Revolt of the Angels) নামক গ্রন্থে বোধ হয় তাঁহার বক্তব্য বিষয় এই যে, নূতন দর্শন-বিজ্ঞানের আলোক পাইয়া মানুষ পুরাতন সরল বিশ্বাস সমূহ হারাইতে বসিয়াছে; এবং ফলে অপকর্ম করিতে মানুষ এখন আর ধর্ম্মের বাধা আগেকার মত অনুভব করে না। এই গ্রন্থে মরিস্ নামক এক যুবক একটী বিবাহিত রমণীর সঙ্গে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছেন; উভয়ের মিলনের একটী নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে; এবং নির্দ্দিষ্ট দিনে সেখানে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হয়।

মনে হয়, ইহার বেশী না বলিলে তাঁহার মূল বক্তব্যের কোনই হানি হইত না। তথাপি একাধিক বার এই সকল মিলনের গূঢ় ব্যাপারের বর্ণনায় তিনি 'রায় গুণাকর'কেও যে কেন অতিক্রম করিয়াছেন, তাহা ভাবিয়া পাওয়া যায় না। কেহ কেহ বলেন, এই সকল বর্ণনায় ঘটনা সংস্থান ফুটিয়া উঠিতেছে। কিন্তু ইহা অপেক্ষা একটু কম বলিলে দোষ হইত কি?

'দেবগণ পিপাসু' (The Gods are Athirst.) নামক গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী বিদ্রোহ নিয়া। উপন্যাসের আকারে তখনকার সামাজিক অবস্থা তিনি আঁকিতে চাহিয়াছেন। এমন একটা সময়ে স্ত্রী পুরুষের সম্বন্ধ-বন্ধন যে অত্যন্ত শিথিল হইয়া যায়, তাহা বলাই বাহুল্য; বিশেষত তার পূর্ব্ববর্ত্তী রাজাদের সময় হইতেই ফরাসী সমাজে পাপের স্রোত বহিতে আরম্ভ হইয়াছিল। সুতরাং এমন একটা সময়ের চিত্র আঁকিতে যাইয়া য়্যানাটোল দুই একটা পাপেরচিত্র আঁকিবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিন্তু তাহার কয়েক বৎসর পরই নেপোলিয়নের দিগ্বিজয় আরম্ভ হয়; এবং নেপোলিয়নের সঙ্গে সংঘর্ষে রুষিয়া পরাজিত ও লাঞ্ছিত হয়, রুষিয়ার এই পরাজয়ের কারণ খুঁজিতে গিয়া টলষ্টয় দ্বিসহস্রাধিক পৃষ্ঠার এক উপন্যাসে তখনকার রুষিয়ার সামাজিক অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন; এবং অনেক অনাচার, অনেক ভোগ-বিলাসের বর্ণনা ও তিনি করিয়াছেন। কিন্তু য়্যানাটোল ফ্রান্সের চিত্রের মত এমত রং ফলাইবার চেষ্টা ত টলষ্টয়ে নাই।

একটা জাতি ধর্ম্মে, সমাজে, রাষ্ট্রে স্বাধীনতার জন্য পাগল হইয়া উঠিয়াছে, এরূপ চিত্র য়্যানাটোল ফ্রান্সের বই খানায় মিলে না; সেখানে মিলে, কোন ও একটী যুবতী কেমন করিয়া একটী যুবকের মন ভুলাইতে চেষ্টা করিয়াছিল; এবং যুবতীরই নিরপরাধ পিতার ফাঁসির ব্যবস্থা দিয়া যুবক যখন তাহার নিকট আসিল, তখন যুবতী তাহাকে পিতৃ-হন্তা বলিয়া ঘৃণা না করিয়া বরং কেমন সাদরে আলিঙ্গন করিয়াছিল; আর মিলে কেমন করিয়া একটী প্রেমিকা তাহার দায়িতকে আইনের কবল হইতে উদ্ধার করিবার জন্য গোপনে বিচারকের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিল, এবং কেমন অম্লান বদনে কিছুক্ষণের জন্য বিচারকটীর চরণে স্বদেহ উপঢৌকন দিয়াছিল, আর কেমন করিয়া এমন দান গ্রহণ করিয়াও বিচারক বিচারে কিছু মাত্র দয়া প্রকাশ করিতে রাজী হয় নাই!

আর দৃষ্টান্তের কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় না। শুনিতে পাই এ সব গ্রন্থে খুব শিল্প-চাতুর্য্য রহিয়াছে। তা কি আর নাই? তা না হইলে আসর জমিবে কেন? বইয়ের কাটতিইবা হইবে কেন? কিন্তু এমন শিল্প এদেশের ও যে কোন কোন বাজারে মিলে দেখিতেছি।

কোথায় ইউরোপের এক জন প্রসিদ্ধ লেখক য়্যানাটোল ফ্রান্স, আর কোথায় অর্দ্ধ এশিয়ার, ততোহধিক অজ্ঞ ভারতের এক কোণে বসিয়া আমরা তাঁহার সমালোচনা

জঙ্গলবাড়ীর সুপ্রসিদ্ধ দেওয়ান সাহেবদিগের ও সুসঙ্গের রাজাদিগের বাসস্থান রাজধানী কলিকাতা হইতে প্রায় চারিশত মাইল দূরে অবস্থিত। উক্ত দেওয়ান সাহেবেরা ও রাজারা তাঁহাদের কার্য্যের সুবিধার জন্য সেকালে মুর্শিদাবাদে ও ঢাকায় এবং পরে কলিকাতায় ও ঢাকায় উকীল নিযুক্ত রাখিতেন। কলিকাতার উকীল জমিদার সরকারের প্রয়োজনীয় চিঠি "আরিন্দা" সহ তাঁহাদের ঢাকার উকীলের নিকট পাঠাইতেন এবং ঢাকার উকীল ঐ চিঠি নির্দ্দিষ্ট পাইক দ্বারা জঙ্গলবাড়ী ও সুসঙ্গ প্রেরণ করিতেন।

কলিকাতায় সংবাদপত্র পরিচালনের ব্যবস্থা হইলে এবং বঙ্গদেশের কেন্দ্রে কেন্দ্রে জেলা স্থাপিত হইলে ডাকের সুব্যবস্থা আবশ্যক হইয়া পড়ে। তখন জেলার প্রধান নগরে ডাকঘর স্থাপিত হয়।

গবর্ণমেণ্টের ডাক যখন রীতিমত চলিতে আরম্ভ করিল, তখন তাহার সেই বিরাট ব্যয় সংকুলন জন্য গবর্ণমেণ্ট ব্যবসায়ীদিগের প্রবর্ত্তিত বেসরকারী ডাক চলাচল প্রথা রহিত করিবার উদ্দেশ্যে তাহা বেআইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন। এবং তাহার প্রবর্ত্তকদিগকে দণ্ডিত করিয়া তাহা উঠাইয়া দিয়া সরকারী ডাকে জনসাধারণের চিঠি গ্রহণ করিবার নিয়ম প্রবর্ত্তন করিলেন। (১)

এই সময় গবর্ণমেণ্ট যে হারে ডাক মাশুল ধার্য্য করিয়াছিলেন, তাহা এত অধিক হইয়াছিল যে, সাধারণের কথা দূরে থাকুক বাণিজ্য ব্যবসায়ীদিগের পক্ষেই সেই হারে মাশুল দিয়া সংবাদ আদান প্রদান করা অত্যন্ত কঠিন হইয়াছিল। এই উচ্চ হারের উল্লেখ করিয়া ঐতিহাসিক মার্সম্যান লিখিয়াছেন——সরকারী ডাকে পত্র প্রেরণ—ভারতবর্ষের ন্যায় দরিদ্র দেশবাসীর পক্ষে এক রকম অসাধ্য ব্যাপার ছিল; এমন কি বাণিজ্য ব্যবসায়ীরা পর্য্যন্ত তাহা একটী গুরুতর ভার বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। (২)

এত অধিক ডাক মাশুলে পত্রিকা চালান অসম্ভব মনে করিয়া অনেক পত্রিকা পরিচালক ডাকের মাশুল কমাইয়া দিবার জন্য গবর্ণর জেনারেল ওয়ারেন হেষ্টিংস নিকট প্রার্থনা করেন।

১৭৮৪ অব্দের ২রা ডিসেম্বর পোষ্টমাষ্টার জেনারেল কলিকাতা হইতে ডাকের চিঠি পত্রের নিম্নলিখিতরূপ মাশুল নির্দ্ধারিত করিয়া দেন।

২॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল—কলিকাতা হইতে—বরাকপুর, হুগলী ও চন্দননগর—এক আনা। বর্দ্ধমান, মুর্শিদাবাদ, রাজাপুর, কুলপী, মেদিনীপুর, বালেশ্বর—দুই আনা। রাজমহল, ভাগলপুর, ঢাকা, কটক—তিন আনা। দিনাজপুর, মুঙ্গের,—চারি আনা। পাটনা ও গঞ্জাম—পাঁচ আনা। চট্টগ্রাম * ও বক্সার—ছয় আনা। কাশী—সাত আনা।

৩॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল—বরাকপুর, হুগলী ও চন্দননগর—দুই আনা। বর্দ্ধমান প্রভৃতি—চারি আনা। রাজমহল প্রভৃতি—ছয় আনা। দিনাজপুর প্রভৃতি আট আনা। পাটনা প্রভৃতি—দশ আনা। চট্টগ্রাম বক্সার—বার আনা। কাশী—চৌদ্দ আনা।

৪॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল—বরাকপুর, হুগলী, চন্দননগর—তিন আনা। বর্দ্ধমান প্রভৃতি—ছয় আনা, রাজমহল প্রভৃতি ॥৵১। দিনাজপুর প্রভৃতি—বার আনা। পাটনা প্রভৃতি—পনর আনা। চট্টগ্রাম ও বক্সার—আঠার আনা। কাশী—এক টাকা পাঁচ আনা।

৫॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল—বরাকপুর প্রভৃতি—চারি আনা। বর্দ্ধমান প্রভৃতি—আট আনা। রাজমহাল প্রভৃতি বার আনা। দিনাজপুর প্রভৃতি এক টাকা। পাটনা প্রভৃতি—পাঁচ শিকা। চট্টগ্রাম প্রভৃতি—দেড় টাকা। কাশী—পৌনে দুই টাকা।

৬॥ তোলা পর্য্যন্ত ওজনের চিঠি পত্রের মাশুল—বরাকপুর পর্য্যন্ত—পাঁচ আনা। বর্দ্ধমান প্রভৃতি—

(১) Private posts had long been established in India by the merchantile community, but Government had thought fit to abolish them under heavy penalties. —J. C. Marshman.

(২) "The postage by the public mail was, for a poor population like that of India, prohibitory and it was felt to be a severe tax even by the merchants."—History of India.

* ১৭৯৫ অব্দে ডায়মণ্ড হারবার হইতে কক্সবাজার পর্য্যন্ত সমুদ্র পথে ষ্টিমার-ডাক প্রচলিত হয়। অতপর এই পথে যাহারা ডাক পাঠাইতেন, তাহাদিগকে মাশুল—চিঠি প্রতি দুই আনা অতিরিক্ত দিতে হইত।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

ঠাকুরমার চিঠি—শ্রীফণিভূষণ রায় বিরচিত।

প্রকাশক—সিটিলাইব্রেরী, ঢাকা,—মূল্য ১।০ আনা।

এই গ্রন্থে ঠাকুরমা এবং নাতিনীর সহিত পত্রালাপে স্ত্রী-শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও প্রণালী, সমাজে স্ত্রীলোকের স্থান স্ত্রীলোকের দায়িত্ব, স্ত্রীস্বাধীনতা, বিবাহ পণপ্রথা, পোষাক আচার প্রভৃতি মেয়েদের এবং অভিভাবকদেরও অবশ্য জ্ঞাতব্য বহু বিষয় আলোচিত হইয়াছে। আলোচনার পদ্ধতি অতি সুন্দর এবং চিত্তাকর্ষক। এই গ্রন্থের ঠাকুরমা বৃদ্ধা হইলেও সেকেলে নহেন। তিনি বিংশ-শতাব্দীর ঠাকুরমা। তাঁহার পত্রে সেই মান্ধাতা আমলের রসিকতা নাই এবং সেই "কানুর গীতি"ও নাই। তিনি বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলকেই জানেন। সকলেরই ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থা এবং তদানুযায়ী নাতিনীকে উপদেশ দিতেও সঙ্কোচিতা নহেন। নাতিনীও আধুনিক সমাজের 'নাটক পড়া সবেল পড়া পালিশ করা' মেয়ে। তিনি যাহা ঠাকুরমার নিকট হইতে আদায় করিয়াছেন তাহা বিনা বিচারে হাবার মত হজম করিতে রাজি হন নাই। বিশেষ যুক্তি তর্ক প্রয়োগ করিয়া আজ-কালকার নব্যা নাতিনীদিগের ন্যায় জিনিসের কদর বুঝিয়া তারপর তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

এই সকল বাদানুবাদ লেখকের হাতে সুন্দর জমিয়াছে। আমরা এই গ্রন্থ পড়িয়া বিশেষ আনন্দ অনুভব করিয়াছি। গ্রন্থকার কালে বঙ্গবাণ্দেবীর কণ্ঠোপযোগী কোন স্থায়ী আভরণ গড়িতে পারিবেন বলিয়া আমাদের ভরসা আছে। গ্রন্থের বহিরাবরণও বেশ মনোরম হইয়াছে। যাঁহারা ঠাকুরমা এবং নাতিনী তাঁহারা 'চিঠি'র রসাস্বাদন করিয়া তৃপ্ত হউন।

আলোক-কণা।

শ্রীঅক্রুরচন্দ্র ধর প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।

ইহা একখানি কবিতা পুস্তক। ইহার অনেক গুলি কবিতা আমাদের ভাল লাগিয়াছে! ভাষা দুর্বোধ্য বা অনন্বয় নহে। ছন্দের একটা অনাবিল গতি আছে। নবীন গ্রন্থকার বীণাপাণির চরণপঙ্কজে যে "অঞ্জলি" প্রদান করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন তাহা সার্থক হউক।

সে কোথায় ?

কতবার, কত মাস কত তিথি গত হায়।
তবুও পাই না তারে রহিয়াছে সে কোথায় ?
হৃদয়-সাগর-নীর, কেমনে থাকিবে থির ?
নিরাশার ঢেউগুলি কত কথা কয়ে যায়!
কত বার, কত মাস, কত তিথি গত হায়!

(২)

চাঁদ ওঠে, ফুল ফোটে, মলয় মধুর গায়!
পরাণ কাঁদিয়ে উঠে কি যেন কাহারে চায় ?
প্রাণের দারুণ ব্যথা, হৃদিভরা যত কথা—
আকুলি ব্যাকুলি কবে নীরবে জানাব তায়!
আমি শুধু তারে চাই সে কিগো আমারে চায়!

(৩)

গভীর বিষাদে ঢাকা আজি এ মরম তল,
ঝরিয়ে গিয়েছে যত হৃদয়ের ফুলদল!
গগনে চাঁদিমা হাসে, আমারি এ হৃদাকাশে
হা হতাশে আসে শুধু আঁধার কেবল ?
তার তরে ঝর্‌ঝরে ঝরে আঁখি-জল!

শ্রীজগদীশচন্দ্র রায় গুপ্ত।

বাঙ্গালী পল্টন।

পেন্সন ও অন্যান্য পুরস্কার আছে, উন্নতি যথেষ্ট। মাসিক বেতন ময় খোরাক পোষাক প্রায় ২৭৲ টাকা, তন্মধ্যে নগদ ১১৲ দেওয়া হয়। ন্যূন পক্ষে যাহাদের উচ্চতা ৫ ফিট ৪ ইঞ্চি, বয়স ১৬-২৫ বৎসর তাঁহারা সত্বর সবডিভিসন্যাল অফিসার, রেজিষ্ট্রার, অথবা নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদন করুন। উত্তমরূপে কার্য্য করিতে পারিলে ১৭ বেতনে নায়েক বা ল্যান্স নায়েক, ২০৲ বেতনে হাবিলদার, ৬০৲ টাকা বেতনে জমাদার এবং ১৩৭৲ টাকা বেতনে সুবেদার পর্য্যন্ত হইতে পারিবেন। এতদ্ব্যতীত স্বদেশ রক্ষার্থে আর এক নূতন সৈন্যদল গঠিত হইয়াছে। যাঁহারা এই শ্রেণীভুক্ত হইবেন তাঁহাদিগকে ভারতবর্ষেই থাকিতে হইবে। বেতনাদি একই প্রকার। ঠিকানা—

ডাঃ এস, কে, মল্লিক।
৪৬ নং বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ময়মনসিংহ লিলিপ্রেসে
শ্রীরামচন্দ্র অনন্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও সম্পাদক কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

সৌরভ

বঙ্গের বর্ত্তমান গবর্ণর লর্ড রোণাল্ডশে।

আশুতোষ প্রেস, ঢাকা।

দণ্ডায়মান হয়। মাসগা উক্ত অঞ্চলের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরীরূপে গণ্য ছিল। ইহা প্রকৃতির দুর্ভেদ্য স্থানে অবস্থিত এবং সুদৃঢ় দুর্গ কর্ত্তৃক রক্ষিত ছিল। আলেকজণ্ডার উৎকৃষ্ট সৈন্য নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তাহাদিগকে সঙ্গে লইয়া মাসগা আক্রমণ করেন। এই সময় আলেকজণ্ডার পুনর্ব্বার শত্রু হস্ত নিক্ষিপ্ত শরে আহত হন। কিন্তু তিনি তাহা তুচ্ছ করিয়া অবিচলিত ভাবে সৈন্য পরিচালনা করিতে থাকেন। আলেকজণ্ডারের অদ্ভুত শৌর্য্য বীর্য্য দর্শনে উৎসাহিত হইয়া তদীয় সৈন্য অমিত পরাক্রমে যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। নয় দিন ব্যাপী যুদ্ধের পর অশ্বকালী সৈন্য শত্রু সৈন্যের সংখ্যাধিক্য বশতঃ নিরুৎসাহ হইয়া পড়ে। তাহাদের অধিপতি কালগ্রাসে পতিত হন, তাঁহার মহিষী ও শিশু রাজকুমার বন্দী হন। অতঃপর আলেকজণ্ডার বিজয়শ্রী লাভ করিয়া অমানুষিক হত্যাকাণ্ড সাধন পূর্ব্বক স্বীয় নাম কলঙ্কিত করেন। সাত হাজার অন্য প্রদেশীয় বেতন ভোগী সৈন্য অশ্বকালী সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। আলেকজণ্ডার জয়লাভ অন্তে এই সকল সৈন্য স্বীয়পক্ষ ভুক্ত করিবার জন্য প্রস্তাব করেন। তাহারা প্রথমতঃ সম্মত হয়। কিন্তু পরে একজন বৈদেশিক রাজার পক্ষাবলম্বী হইয়া স্বদেশীয়দের রক্তপাত করা অধর্ম্ম জনক বলিয়া বিবেচনা করে। এজন্য তাহারা রাত্রি যোগে পলায়ন পূর্ব্বক আপনাদের বাস ভূমির অভিমুখে যাত্রা করে। আলেকজণ্ডার এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া উঠেন এবং সসৈন্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করেন। আক্রান্ত সৈন্যদল আপনাদের স্ত্রীপুত্রদিগকে মধ্যস্থলে রক্ষা করিয়া চক্রাকারে দণ্ডায়মান হয় এবং অধিক পরাক্রমে আততায়ী সৈন্যের প্রতিরোধ করিতে থাকে। কিন্তু অবশেষে তাহারা শক্তি শূন্য হইয়া পড়ে এবং অসম্মান অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃকল্প বিবেচনা পূর্ব্বক শত্রুর তরবারিতে জীবন সমর্পণ করিয়া কীর্ত্তি মন্দিরে স্থান লাভ করে। প্লুটার্কের মতে আলেকজণ্ডারের এই কার্য্য তাঁহার বিমল যশোরাশিতে কলঙ্ক চিহ্নরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে।

আলেকজণ্ডার প্রথম এক বৎসর কাল প্রাগুক্ত ক্ষুদ্র রাজ্য সমূহে অতিবাহিত করিয়া সিন্ধুনদ উত্তীর্ণ হইয়া তক্ষশিলা রাজ্যে প্রবেশ করিলেন, তক্ষশিলার অধিপতি অম্ভির সঙ্গে পূর্ব্বেই সন্ধি স্থাপিত হইয়াছিল, এই কারণ তিনি তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। আলেকজণ্ডার অম্ভিকে সে রাজ্যের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন। অম্ভি বিজেতার প্রসাদ লাভে প্রীত হইলেন এবং তাঁহাকে এবং তাঁহার আত্মীয় স্বজনদিগকে স্বর্ণ মুকুট উপহার প্রদান করিয়া সম্মানিত করিলেন। গ্রীক সৈন্যের জন্য প্রচুর আহার্য্য প্রদত্ত হইল। ফলতঃ রাজা অম্ভি আলেকজণ্ডারের অনুগ্রহ ভাজন হইবার উদ্দেশ্যে যথেষ্ট বদান্যতার পরিচয় প্রদান করেন। কিন্তু কৌশলজ্ঞ আলেকজণ্ডার তাঁহাকে সখ্য সূত্রে আবদ্ধ রাখিবার উদ্দেশ্যে তদপেক্ষা অধিক বদান্যতা প্রদর্শন আবশ্যক বলিয়া অবধারণ করিলেন। তদর্থে তিনি অম্ভির সমস্ত উপহার দ্রব্য প্রত্যর্পণ পূর্ব্বক তাঁহাকে বহু স্বর্ণ ও রৌপ্য ভোজন পাত্র, পারস্য জাত অগণিত পরিচ্ছদ, ত্রিংশৎ সংখ্যক সুসজ্জিত অশ্ব এবং সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা উপহার দিলেন। আলেকজণ্ডারের কর্ম্মাধ্যক্ষ বৃন্দ তাঁহার তাদৃশ বদান্যতা দর্শনে বিরক্ত হইয়া উঠেন। কিন্তু এই উপায়ে পঞ্চ সহস্র রণ নিপুণ যোদ্ধা লব্ধ হইল! অম্ভি রাজার বশ্যতা চির সৌহৃদ্যে পরিণত হইল, ভারত অভিযান কালে বহু সহায়তা লাভের পথ পরিস্কৃত হইল। সেকালে তক্ষশিলা ভারতবর্ষের অন্যতম প্রধান রাজ্যরূপে গণ্য ছিল। তাদৃশ পরাক্রান্ত রাজ্যের অধিপতি অতি সহজে গ্রীক বীরের নিকট বশ্যতা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, ইহাতে বিস্ময় জন্মিতে পারে; কিন্তু ঈর্ষ্যা এবং পররাজ্য লালসা তাঁহাকে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য করিয়া ছিল। তিনি প্রখ্যাত নামা বীরের সাহায্যে আপনার শত্রু পুরু রাজা এবং অভিসারাধিপতির বিনাশ সাধন করিতে সংকল্প করিয়াছিলেন।

আলেকজণ্ডার অম্ভি রাজার বশ্যতা দর্শনে পুরু রাজারও তদনুকরণ সম্বন্ধে আশান্বিত হন এবং তজ্জন্য তাঁহাকে বশ্যতা জ্ঞাপনার্থে আগমন করিতে আহ্বান করেন। এতদুত্তরে পুরু * সদর্পে লিখিয়া পাঠান, আমি আপনার

* পুরু সম্ভবতঃ পৌরব শব্দের অপভ্রংশ। পৌরব বংশীয় নরপতি বলিয়া এই উপাধি ছিল। ইহা নাম নহে।

আবশ্যক। অনেক জ্যোতির্ব্বিদই এই মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। পূর্ব্বে হাতেই এই মানচিত্র অঙ্কিত করিতে হইত। কিন্তু এখন ব্যোম নিরীক্ষণে অনেক স্থলেই জ্যোতিষ্কের ফটো তুলিয়া লওয়া হয়। যাহা হউক জ্যোতির্ব্বিদেরা পরিশ্রম করিয়া যে সকল মানচিত্র তৈয়ার করিয়াছিলেন, তাহাতে পঞ্চনবতীটি শ্রেষ্ঠ চান্দ্র পর্ব্বত এবং প্রায় কুড়ি হাজার আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন।

বিগত শতাব্দীতে যে সকল জ্যোতির্ব্বিদ চন্দ্রমণ্ডলস্থ আগ্নেয়গিরির অগ্নিকাণ্ডের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, সুপণ্ডিত হর্শেল তাঁহাদের মধ্যে একজন। চন্দ্রমণ্ডলে যে সকল কাল কাল দাগ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মধ্যে মধ্যে তিনি উজ্জ্বল আলোকও দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহা হইতেই তিনি অনুমান করিয়াছিলেন যে চন্দ্রে আগ্নেয় পর্ব্বত আছে।

স্কৃটার নামক একজন জ্যোতির্ব্বিদ তাঁহার জীবনের অনেকাংশই চন্দ্র পর্য্যবেক্ষণে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রায়ই লক্ষ্য করিতেন যে চন্দ্রে মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। আগ্নেয়গিরির কার্য্যই এই পরিবর্ত্তনগুলির কারণ বলিয়া তাহার মনে হইত না। তিনি মনে করিতেন যে এই পরিবর্ত্তন চন্দ্রের বায়ুমণ্ডলের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে হইয়া থাকে। যাহা হউক, তাহার একটী পরীক্ষা সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। ১৭৮৮ খৃঃ নবেম্বর মাসে তিনি দেখিলেন যে, চন্দ্রের প্রশান্ত সাগর * নামক স্থানের লিনিয়াস্ মুখগহ্বরের স্থানে একটী কাল দাগ রহিয়াছে, পূর্ব্ব পূর্ব্ববারের পরীক্ষায় এই স্থানটী তৎ নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহ হইতে কিছু উজ্জ্বল দেখা যাইত। যদি ইহা সত্য হইয়া থাকে তবে চন্দ্রে যে সময় সময় আগ্নেয় গিরির ক্রিয়া হইয়া থাকে তাহাতে কোন সন্দেহ থাকিতে পারে না।

স্কৃটারের পর অনেক জ্যোতির্ব্বিদই এই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে একটু একটু অনুমান করিয়া গিয়াছেন। মিঃ ওয়েব ১৮৬৫ খ্রীঃ এই পরিবর্ত্তন আট বার লক্ষ্য করেন।

কপারনিকাস নামক চান্দ্রপর্ব্বতের মুখগহ্বর মাঝারি দূরবীণেই বেশ ভালমতে পরিদৃশ্যমান হয়। এই গহ্বরের নানাচিত্রও কোন কোন মানমন্দির হইতে প্রস্তুত করান হইয়াছিল। ১৮৬২ খৃঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী তারিখে ঐ স্থান টুকুর দক্ষিণ পশ্চিমদিকে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্তূপাকার পাহাড়ের মত স্থান দেখা গিয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত মানচিত্রে ঐ ঐ উজ্জ্বল গিরিগহ্বরগুলি নির্দ্দেশ করা হয় নাই. এই স্থানটী কপারনিকাস্ ও ইরেস্থিনিস্ নামক স্থানের মধ্যে অবস্থিত। শেষোক্ত স্থানটী মৌচাকের মত আকার ধারণ করিয়াছে কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কোন মানচিত্রে এই সকল স্থানের বিশেষত্ব নির্দ্দেশ করা হয় নাই। ইহাতে বোধ হয় যে এই স্থান পূর্ব্বে এরূপ ভাবে ছিল না। বর্ত্তমানে এরূপ হইয়াছে।

চন্দ্রমণ্ডলে মার্সেনিয়াম নামক অঙ্গুরীয়কের আকার সদৃশ অন্য একটী পাহাড় আছে। ঐ পাহাড়ের উপরিভাগ কূর্ম্মপৃষ্ঠের ন্যায় ক্রমোন্নত; তাই চন্দ্রপর্য্যবেক্ষণকারী জ্যোতির্ব্বিদগণের দৃষ্টি বিশেষরূপে এই পাহাড়ের উপর পতিত হয়। স্কৃটার প্রভৃতি জ্যোতির্ব্বিদগণ বলেন যে এই পাহাড় সম্পূর্ণ মসৃণ। এই সকল জ্যোতির্ব্বিদ বড়ই মনোযোগের সহিত অনেক পরিশ্রম করিয়া এই স্থানের সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম মানচিত্রও প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৩৬ খৃঃ অব্দে বিয়ার ও মেডলারের মানচিত্র প্রকাশিত হওয়ার ২। ১ বৎসর পরে মিঃ ওয়েব এই সম্পূর্ণ মসৃণ পাহাড়ের উপর একটী ছোট আগ্নেয়গিরির মুখগহ্বর দেখিতে পাইলেন। কিন্তু ইহা নিয়া জ্যোতির্ব্বিদগণ এক মতাবলম্বী হইতে পারেন নাই। হয়ত ওয়েব যাহা দেখিয়াছিলেন, পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদগণের চক্ষে তাহা পরে নাই। তাঁহাদের মনে বড়ই সন্দেহ জন্মিল। এমন সময় সংবাদ প্রচারিত হইল যে এথেন্স নগরে একজন বিশ্বস্ত জ্যোতির্ব্বিদ পরীক্ষক এ বিষয়ে সন্তোষজনক প্রমাণ পাইয়াছেন।

আমরা ইতঃপূর্ব্বে বলিয়াছি যে স্কৃটার প্রশান্ত সাগরের লিনিয়াস নামক আগ্নেয় মুখ গহ্বরের কথা উল্লেখ করিয়াছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে একটী কাল দাগ এই গহ্বর মুখে দেখা দিয়াছিল। যখন তপনদেব খরতর কিরণ জাল ইহার উপরে বিস্তার করিতেন তখন এই স্থানটীতে একটী

* Sea of Serenity—পূর্ব্বে চন্দ্রের কোন২ অংশ সমুদ্র বলিয়াই কল্পিত হইত কিন্তু এগুলি সমুদ্র নহে প্রমাণিত হইলেও স্থানগুলি পূর্ব্বের নামেই এখনও পরিচিত আছে।

এখানকার লোকে ইউগণ্ডাকে "ইউগোগো" এবং ইহার প্রচলিত ভাষাকে "কিগোগো" বলে। ইহার অধিবাসীরা দুইভাগে বিভক্ত—শগোগো ও ওয়াগোগো। যখন ইউগণ্ডায় প্রথম ইংরাজ প্রবেশ করেন, তখন মটেসা নামক একজন রাজা এই সমগ্র প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। ইহাঁর অধীনে প্রায় ২০ হাজার পদাতিক সৈন্য ও ৩০০ যুদ্ধ ডোঙ্গা ছিল। প্রায় ১৫। ১৬ বৎসর যুদ্ধের পর রাজার ক্ষমতা একবারে লোপ পায় এবং ইংরাজের বাহুবলের গুণে দেশের প্রায় সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপিত হয়। আমি যখন ঐ দেশে গমন করি, তখন কিন্তু দেশীয় রাজবংশ একবারে দূরীভূত হয় নাই। রাজা তখনও পর্য্যন্ত তাঁহার প্রাচীন প্রাসাদে বাস করিতেছিলেন, তবে তাঁহার হাতে বিন্দুমাত্র ক্ষমতা ছিল না।

ইউগণ্ডায় ইংরাজ অধিকার আরম্ভ হইবার পর সাহেবদের নিজেদের মধ্যে এক বিষম কলহ আরম্ভ হয়। আপনারা অবশ্যই জানেন, খ্রীষ্টানেরা রোমান কাথলিক ও প্রোটেষ্টাণ্ট এই দুই প্রধান শাখায় বিভক্ত। ইংরাজ রাজত্ব স্থির হইবার পর এখানে এই দুই শাখার পাদরীরা দলে দলে আসিতে আরম্ভ করেন। তাঁহারা যখন প্রচার কার্য্য আরম্ভ করেন, তখন দুই দলের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হয়। শেষে ইহা রীতিমত বিবাদে পরিণত হয়—এমন কি অনেক স্থানে হাতাহাতি হইয়া রক্তস্রোত পর্য্যন্ত বহিয়া যায়। গভর্ণমেণ্ট এই বিবাদ মিটাইবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনও মতে কৃতকার্য্য না হইয়া অবশেষে এই দেশকে তিনভাগে বিভক্ত করিয়া দেন—কাথলিক, প্রোটেষ্টাণ্ট ও মুসলমান। নিয়ম করিয়া দেওয়া হইল যে, কোনও প্রচারক নিজের বিভাগ ছাড়িয়া অন্য বিভাগে যাইতে পাইবেন না। এখনও পর্য্যন্ত ঐ নিয়ম চলিতেছে।

বৃটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকার ন্যায় এখানেও বড়২ কর্ম্মচারী ইংরাজ। তবে ছোট২ কর্ম্মচারিরা অনেক স্থানেই দেশীয় লোক দেখিলাম। প্রথমে বিনিময়ে কড়ি চলিত, এক্ষণে সর্ব্বত্র আমাদের দেশের টাকা, পয়সা, শিকি প্রভৃতি চলিতেছে। সমগ্র ইউগণ্ডায় ৪০০০ সৈন্য রক্ষিত আছে। ইহাদের মধ্যে তিন হাজারের অধিক ভারতের লোক—শিখ ও পাঠান। অবশিষ্ট এই দেশ হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছে। যাহারা ভারতবর্ষ হইতে আসে তাহাদিগকে এখানে তিন বৎসরের কড়ারে আসিতে হয়। ব্রিটিশ পূর্ব্ব আফ্রিকাতেও প্রায় ২৫০০ ভারতীয় সৈন্য আছে।

এদেশে সিবিল পুলিশের সংখ্যা খুব কম। দেশ এখনও সুশাসিত নয় ব'লয়া এখানে মিলিটারি পুলিশ শান্তি রক্ষার কাজ করিতেছে। ইহাদের হাতে ক্ষমতা অত্যন্ত অ'ধক। কাহারও উপর সামান্য সন্দেহ হইলেই গুলি চালাইতে পারে। বিনা ওয়ারেণ্টে যাহাকে ইচ্ছা গ্রেপ্তার করিবার ক্ষমতা সামান্য সিপাহীর পর্য্যন্ত আছে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি এই সব দেশে—লোকসংখ্যার হিসাবে পুলিসের সংখ্যা খুব কম। সেইজন্য এখনও দেশের সর্ব্বত্র শান্তি সংস্থাপিত হয় নাই। এই রেল ও তার শেষ হইলে আশা করা যায় দেশের অবস্থা অনেক ভাল হইবে।

ইউগণ্ডার রাজধানী মেনাগা। ইহা ভিক্টোরিয়া হ্রদের এক ক্ষুদ্র উপসাগরের উপর অবস্থিত। ইহার বর্ত্তমান অধিবাসীর সংখ্যা প্রায় এক লক্ষ। অসভ্য আফ্রিকায় এত বড় সহর খুব অল্পই আছে। ইউরোপের রোমের মত ইহার অধিকাংশ কয়েকটি নাতি উচ্চ পর্ব্বতের উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজার বাড়ী এক পাহাড়ের উপর অবস্থিত। রাজবাড়ীর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। ইহার বেড় দুই মাইলের অধিক। একটি পাহাড়ের উপর ইংরাজ এক দুর্গ বেষ্টিত ক্ষুদ্র সহর খাড়া করিয়াছেন। ইউগণ্ডার চীফ কমিশনর (Chief Commissioner) সাহেব এইখানে বাস করেন। এই ইংরাজি সহরে ও ইহার চারিদিকে ভারতবর্ষীয় ব্যবসায়ীরা অবস্থিতি করে। ইহাদের সংখ্যা (আমি যখন দেখিয়াছি) প্রায় ১২। ১৩ শত হইবে। ইহাদের মধ্যে পারশী, মাড়োয়ারি, গুজরাতী ও মুসলমানের সংখ্যাই অধিক। যুক্ত প্রদেশের ও মান্দ্রাজের চেটি সম্প্রদায়কেও দেখিলাম, কিন্তু বাঙ্গালা দেশের লোক একজনও নাই। রতিকান্ত বলিল, "সর্দ্দার সাহেব! আমাদের দেশের লোকেরা ভয়ানক কুড়ে। তাহারা ঘরে বসিয়া মুখের জোরে দুনিয়া জয় করিতে পারে। বক্তৃতায় তাহারা রোজ কত যে ভাল২ উপদেশ দেয়, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু ঐ সব উপদেশ নিজেরা কখনও পালন করে না। যাহাতে

"কিরূপে নষ্ট করিয়াছে ?

"তাহাকে তপ্ত তৈলে ফেলিয়াছিলাম, তৈলের মধ্যে বসিয়া সে কি গান করিল, আর তৈল ঠাণ্ডা হইয়া গেল। তাহার পরে তাহাকে আগুনে ফেলিয়াছিলাম ; আগুন নিভিয়া গেল। মহারাজ, সে তপ্ত নরক একবারে ঠাণ্ডা করিয়া ফেলিয়াছে। নরকে আর জ্বালা নাই।"

"বলিস কি ?"

"হাঁ মহারাজ, এইরূপই বটে।"

"চল। আমি যাইব।"

অশোক চণ্ডগিরিককে লইয়া নরকে আসিলেন। ভিক্ষু তাঁহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিল—

"সকলের কল্যাণ হউক, জগতের মঙ্গল হউক।"

"তুমি কে ?"

"আমি ভিক্ষু।"

"তুমি আমার নরকের জ্বালা নিভাইয়াছ ?

"জ্বালা নিভাইবার আমার সাধ্য কি মহারাজ। যিনি জীবের সকল দুঃখ, সকল জ্বালা নিভাইয়াছেন, সেই তথাগতই আপনার নরকের জ্বালাও দূর করিয়াছেন। মঙ্গল হউক, মহারাজ।"

"আমি দোষীকে নরক যন্ত্রনা ভোগ করাইয়া বড়ই আনন্দ পাইতাম।"

"মহারাজ, জীবের প্রতি করুণা করুন, উহা অপেক্ষা শতগুণ আনন্দ হইবে। ভগবান্ তথাগত, সর্ব্বজীবে মৈত্রী ও করুণার কথা বলিয়া গিয়াছেন।"

ভিক্ষুর মুখ বড় শান্ত, বড়ই করুণা মণ্ডিত। তাঁহার নয়ন হইতে যেন করুণার ধারা ক্ষরিতেছিল। তাঁহার করুণা মাখা কথাগুলি শুনিয়া চণ্ড অশোক কি ভাবিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয়ে ঝড় বহিল। অশোক একবার চণ্ডগিরিকের মুখের দিকে আর একবার ভিক্ষুর মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। ভিক্ষুর বদন কি শান্ত, কি মমতা মাখা ! এ যদি মানুষ, চণ্ডগিরিক যে, তাহা হইলে পশুরও অধম। হায় হিংসায় মানুষকে এমনই অধম করে। আমিও ত উহারই মত অধম হইয়াছি।

আপনার কার্য্যের জন্য অশোকের অনুতাপ জন্মিল। আপনাকে ধিক্কার দিয়া চণ্ডগিরিকের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আর নরক চাইনা, জগতে যন্ত্রণা আনিয়াছিলাম, জীবকে যন্ত্রণা দিয়া আনন্দ পাইতাম, আর না, যদি পারি জীবের যন্ত্রণা দূর করিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত করিব। তুই পাটলীপুত্র ছাড়িয়া চলিয়া যা।"

(৫)

"ভিক্ষু, জীবের প্রতি মৈত্রী করুণা আমার নাই। আমি যে তাহাদিগকে যন্ত্রণা দিয়াই আনন্দ পাইতাম। বলিতে পার কেন এমন হইয়াছিল ?

"তুমি জীবদিগকে তোমার মত বলিয়া কখনও ভাব নাই। তাহাদেরও যে একটা সুখ দুঃখ আছে এবং সে সুখ দুঃখ যে তোমারই মত, তাহা একবারও অনুভব কর নাই। মহারাজ, জীবকে যন্ত্রণা দিয়া, বধ করিয়া, তোমার একটা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি চরিতার্থ হইয়াছে। উহা একটা উত্তেজনা মাত্র ; আনন্দ নহে। এখন জীবের প্রতি মৈত্রী ও করুণা দেখাও, আনন্দ পাইবে ; জগৎ সুখময় দেখিবে। সকলে তোমার আপন হইবে।"

"কিরূপে আমার প্রাণে মৈত্রী ও করুণা আসিবে, ভিক্ষু। আমি যে চণ্ড-শোক।"

"তুমি সকল জীবকে আপনার মত ভাব, তোমার মতই সকল জীবের যে সুখ দুঃখ আছে অনুভব কর, তবেই সকলকে সুখী করিতে আকাঙ্খা হইবে। তোমার হৃদয়ে মৈত্রী ও করুণা উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।"

"মহারাজ, যন্ত্রণার নরক গড়িয়াছিলে, এখন শান্তির স্বর্গ প্রতিষ্ঠা কর। তথাগত, তোমাকে কৃপা করুন।"—বলিতে বলিতে সেই মুণ্ডিত মস্তক শান্তশ্রী ভিক্ষু চলিয়া গেল।

(৬)

অশোকের হৃদয়ে ঝড় বহিয়াছিল, এবার বিদ্যুৎ চমকিল। অশোক দেখিলেন সত্যই তিনি কোন জীবকেই আপনার মত বলিয়া ভাবেন নাই। কাহারও প্রাণে যে সুখ দুঃখ বোধ আছে, একথা তাহার মনে হয় নাই। সকলকে দুঃখ দিয়াছেন, কাহাকেও সুখী করেন নাই।

সম্মুখে নরকের আগুন তখনও জ্বলিতেছিল অশোক সেই আগুনে হাত দিলেন, হাত জ্বলিয়া গেল। অশোক হাত টানিয়া লইয়া শিহরিয়া উঠিলেন—হায়, কত লোককে এ

যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, বিনা রক্তপাতে তাহা হয় নাই। কিন্তু উদার ধর্ম্ম আমাদের; আচার সংযত করিতে চাহে সত্য, কিন্তু বিচারে কোথাও বাধা দেয় না। আমরা কেন অসীম জ্ঞানের পথে আমাদের জাতির মনকে চালাইয়া দেই না?

ভাবুক ও কর্ম্মী।—প্রাচীন গ্রীকদের মধ্যে এক বার প্রশ্ন উঠিয়াছিল, কর্ম্মীর জীবন বড় না ভাবুকের জীবন বড়? মীমাংসা হইয়াছিল, গভীর তত্ত্বের—দর্শন, বিজ্ঞান ও সমাজের গূঢ় সত্যের অনুসন্ধানে যে জীবন ব্যয়িত হয়, তাহাই শ্রেষ্ঠ। অবশ্যই ইহা ছিল এক পক্ষের সিদ্ধান্ত, জীবিকার জন্য যাহাদের খাটিতে হইত না তাহাদের সিদ্ধান্ত। কর্ম্মী সে দেশে তখনও ছিল এবং তাহারা নিজেদের জীবনটাকে নিতান্তই মূল্যহীন মনে করিত না। জ্ঞান ও কর্ম্মের কলহের সহিত আমরাও সুপরিচিত। এবং আমাদের দেশেও বিবিধ প্রকার মীমাংসা হইয়াছিল। এবং ঈশপ উদর ও হস্তপদাদির রূপক দ্বারা ব্যক্তির এবং সমাজের বিবিধ প্রকার শক্তির যে সমন্বয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, গীতার রূপকের সাহায্য ছাড়া অধিকতর গভীর ভাবে তাহা করা হইয়াছিল।

কিন্তু মানুষের জীবন এখনও শেষ হয় নাই। শতাব্দীর পর শতাব্দীতে নূতন নূতন অবস্থার ভিতর মানুষকে বার বার পুরাতন প্রশ্নের বিচার করিতে হইতেছে। জ্ঞান ও কর্ম্মের মধ্যে কে বড়, এই প্রশ্নও কাজেই এখনও আমাদের মধ্যে জীবিত রহিয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বিপ্লুত ফরাসী দেশে এবং কারুশালায় পূর্য্যমান সমগ্র ইউরোপে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে মনে হয় একটা কথার নিষ্পত্তি হইয়া গিয়াছে; এখন আর কে শ্রেষ্ঠ কে নিকৃষ্ট এই প্রশ্নের কোন অর্থ নাই, কারণ এখন আমরা বুঝি সকলই পরস্পরের জন্য দরকার। কারুশালার ক্রোর পতি যে মনে করিবেন, যে ব্যক্তি কেবলই মুদ্রিত বা লিখিত অক্ষর ঘাটিয়া বাহির করিতে চায়—রোমের অধিবাসীরা কিসে বড় হইয়াছিল কিংবা গ্রীক সভ্যতার কি বিশিষ্টতা ছিল, সমাজে তাহার কোন উপযোগিতা নাই, নিরর্থকই তাহাকে বেতন দেওয়া হয়,—তাহা আর এখন হইবার যো নাই; আর, বিবিধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি যে মনে করিবেন, যে ব্যক্তি মাটী খুঁড়িয়া লোহা বাহির করে এবং লোহা পিটাইয়া নানাবিধ দ্রব্য তৈয়ার করে, সে একটা মস্ত অপকর্ম্ম করে, সে তিক্ত,—তাহাও হইবার যো নাই। শিক্ষক ও অধ্যাপকগণ—যাঁহাদের মুখে অন্ততঃ স্বীকৃত কার্য্য হইতেছে—বালক ও যুবকদের মন গঠন করা, তাহাদের কার্য্য যেমন সমাজের উপকারী, যাহারা বিবিধ কারুকর্ম্ম ও ব্যবসায় দ্বারা সমাজের ধন বৃদ্ধি করে তাহাদের কাজও তেমনই হিতকর। একথা আজ কাল মোটামুটি স্বীকৃত। বর্ত্তমানে সুতরাং কে বড় কে ছোট—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়া শ্রীবৎস রাজার মত লাঞ্ছিত হইতে হইবে না।

বর্ত্তমানে বিচার্য্য বিষয় কর্ম্মী ও জ্ঞানীর পরস্পর সম্বন্ধ। এই সম্বন্ধেও মনে হয় ফরাসী দার্শনিক কোঁতের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে কাহারও আপত্তি নাই। জ্ঞানী জ্ঞান দিবেন এবং কর্ম্মী সেই জ্ঞান অনুসারে কাজ করিবেন, ইহা ইউরোপের সকল দেশেই আজ কাল স্বীকৃত। বার্ক ও মিলের চিন্তা প্রবাহ ইংলণ্ডের রাষ্ট্রে ও সমাজে কম প্রভাব বিস্তার করে নাই; কিন্তু তাঁহারা দেশের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন না; এবং মিল অন্ততঃ দেশ বিশ্রুত বাগ্মীও ছিলেন না। কর্ম্মীরা তাঁহাদের সুচিন্তিত পরামর্শ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত ছিলেন না। প্রাচীন গ্রীসে সক্রেটিসের শিক্ষা যেমন গোপনে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, যদি ও সক্রেটিস্ নিজে একখানা বইও লিখেন নাই, তেমনই মিলের বাড়ীতে যে সকল কর্ম্মী পার্লেমেণ্টের সভ্য একত্র হইতেন, মিলের শিক্ষা ও পরামর্শই তাঁহাদের কার্য্য প্রণালী নির্দ্ধারিত করিয়া দিত। নব্য জার্ম্মেনীর সভ্যতা ও বর্ত্তমান সমরের জন্য যে দেশের অধ্যাপকদিগকে কি পরিমাণে দায়ী করা হইয়া থাকে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে, এই উপলক্ষে নীট্‌চে ও ট্রীট্‌চ্‌কের নাম যত বার করা হইয়াছে, হিণ্ডেনবার্গ এমন কি স্বয়ং কৈসরের নামও তাহার চেয়ে খুব বেশী নেওয়া হইয়াছে কি না সন্দেহ। কর্ম্মকে পরিচালিত করিবার অধিকার জ্ঞানের যে আছে, তাহা সুতরাং স্বীকৃত। সমাজে শ্রম বিভাগ যখন হইয়া গিয়াছে, তখন ইহাই যে স্বাভাবিক সম্বন্ধ তাহা অস্বীকার করিবার

বিদ্যাপতি চণ্ডীদাসের নাম করেন না এমন লেখক বাংলায় কম। কিন্তু যেরূপ সমাজে, যেরূপ আচার ব্যবহারের ভিতর ইহাদের জন্ম হইয়াছিল, যে ধর্ম্ম বিশ্বাস ইহাদের লেখায় প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার প্রকৃত মূল্য নিরূপণের চেষ্টা আমরা ক'রি কি? পরকীয়া নায়িকা না হইলে যাঁহাদের রসের সঞ্চার হইত না, সোজা কথায়, বিধবা রজকিনী না হইলে যাঁহারা কবিতা লিখিতে পারিতেন না, তাঁহাদিগকে ক্ষমা করিতে পারি, তাঁহাদিগকে ভুলিয়া গিয়া তাঁহাদের কবিতা পড়িতে পারি, কিন্তু তাঁহাদিগকে বুদ্ধ বা যীশুর মত সম্মান করিতে পারি না। বিলাসের ভিতর দিয়া ভগবৎ প্রাপ্তির চেষ্টা, কামোৎসবের হুতাশনে দেবতার আরতি, প্রভৃতিকে কেহ যদি সমীচীন মনে না করে তবে সে তাহা বলিবে না কেন? এক কথায়, বৃক্ষের মত ফল দেখিয়া এ সকলেরও বিচার হইবে না কেন?

শাক্ত বৈষ্ণবের কলহ এ দেশের একটা প্রাচীন জিনিষ। আমরা হয়ত কেহ বা শাক্ত, কেহ বা বৈষ্ণব। কিন্তু পর মত সহিষ্ণুতার দোহাই দিয়া আমরা কেহই কাহার ও সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই না। কিন্তু ইহা কি ঠিক? আমরা প্রচার চাই না; উনবিংশ শতাব্দীর দর্শন বিজ্ঞানের পরে, মিল-বেন্থামের শিক্ষার পরে, ধর্ম্ম প্রচারের চেষ্টা একটু কমাইলে দোষ নাই। কিন্তু বিচার থাকিবে না কেন? বিচারে সমাজ টলকাইয়া পড়িবে না, তাহাতে নীতির ভিত্তি শিথিল হইবে না।

খ্রীষ্টান ধর্ম্ম ইউরোপীয় মানব সমাজের কিংবা সমগ্র মানবজাতির কি করিয়াছে কিংবা কি করিতে পারে সে বিচারে খ্রীষ্টান মনীষীগণ উদাসীন নহেন। কিন্তু শাক্ত বা বৈষ্ণব ধর্ম্ম আমাদের কি করিয়াছে এবং কি করিতেছে, সে বিচার আমরা করিতে চাইনা কেন? প্যারিস বা পাড়ুয়ার বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের কি করিয়াছে, তাহা ভাবিতে ইউরোপের ঐতিহাসিক কুণ্ঠিত হন না; নালন্দার বিশ্ববিদ্যালয় কি উপকার বা অপকার করিয়াছে তাহার বিচারে কাহারও দ্বিধা দেখিলে আমরা তাহাকে ঐতিহাসিক বলিতে চাহিব না; কিন্তু আমাদের বর্ত্তমান বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের কি করিতেছে, তাহা আমরা ভাবিতে চাই না কেন? বিভিন্ন ধর্ম্মপদ্ধতির মূল্য নিরূপণ ও ধর্ম্মের উৎপত্তি অভিব্যক্তি প্রভৃতি নিয়া ইউরোপে এক নূতন বিজ্ঞান জন্মলাভ করিয়াছে; আমরা তাহার খবর রাখি, কিন্তু অনুকরণ করি না কেন? শিল্পশালা, বিশ্ববিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান (institution) নিয়া ইউরোপের সাহিত্যে বিচার হয়, আমাদের কেন হয় না?

বিচারের প্রণালী সহজ; বৃক্ষের ন্যায় এ সকলও "ফলেন পরিচীয়তে।" খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রশংসা যাঁহারা করিয়া থাকেন তাঁহাদের অনেকেরই অন্যতম যুক্তি এই যে, ইউরোপের যে অধিবাসীবৃন্দকে নীট্‌চে সাদা রংয়ের দ্বিপদ পশু বলিয়াছেন তাহাদিগকে উহা মানুষ করিয়া তুলিয়াছে। যে ধর্ম্ম পশুকে মানুষ করিতে পারে, অসভ্যকে সভ্য করিতে পারে, তাহার ফল কি মন্দ? খ্রীষ্টান ধর্ম্মের ইতিহাসে এক সময় নানা আবর্জ্জনা ইহাকে কলুষিত করিয়া তুলিয়াছিল সত্য, কিন্তু আদিতে সে সমস্ত ছিল না, এবং বর্ত্তমানে খ্রীষ্টান দার্শনিকগণ নানা উপায়ে সে সমস্ত আবর্জ্জনা দূর করিতে চেষ্টা করিতেছেন এবং বহুল পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছেন। ফলানুসারে সুতরাং খ্রীষ্টান ধর্ম্মের পরিচয় ত মন্দ নয়।

এই ভাবে যাঁহারা খ্রীষ্টান ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রকটিত করিতে চান, তাঁহারা অভ্রান্ত কিনা সে বিচার এখানে করিতে চাই না। কিন্তু আমরাও ত একাধিক ধর্ম্মমত একাধিক সাধন-প্রণালীর সহিত পরিচিত; সেগুলির ফল দেখিয়া পরিচয় নিতে চেষ্টা আমরা করি না কেন? দৃষ্টান্তস্বরূপ বৈষ্ণব ধর্ম্মের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। রাধা-ভাব যে ধর্ম্মের প্রাণ, ঈশ্বরকে পতি এবং নিজকে পত্নী কল্পনা করিয়া যে ধর্ম্ম ভগবৎপ্রেমের বিকাশ করিতে চায়, পরকীয়ার সংস্রব না হইলে যে ধর্ম্মের রসাস্বাদন সম্ভব হয় না, কিশোরী-ভজন প্রভৃতি যে ধর্ম্মের অঙ্গীভূত ছিল, জয়দেব বিদ্যাপতির কবিতাগুলি সুন্দর বলিয়াই সে ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ বলা যায় না। দেখিতে হইবে, এই ধর্ম্ম যাহারা অনুসরণ করিয়াছিল কিংবা করিতেছে, তাহারা কি প্রকারের লোক, তাহাদের চরিত্র কেমন, এবং মানুষের অবশ্য পালনীয় বিধিনিষেধ ইহারা কি ভাবে গ্রহণ করে। যে ধর্ম্ম মানুষকে মানুষ হিসাবে তাহার সাধারণ কর্ত্তব্য হইতে দূরে নিয়া যায়, বুঝিতে হইবে সে ধর্ম্মের ফল মন্দ

এই ভাবে "দুর্গোৎসব" কবিতার আরম্ভ। এই কবি তাটী সুমার্জ্জিত উচ্চ শ্রেণীর কল্পনায় অভিষিক্ত। বঙ্গ-জননীর নিরানন্দ ময় প্রাণে বৎসরে একবার দুর্গোৎসব কি আনন্দ আনয়ন করে ইহা তাহারই করুণ বর্ণনা।

"এই দিন ভারতের কত পুণ্যময়,
অনন্ত নরকে বহে মলয় বাতাস!
প্রজ্জ্বলিত মহা চিতা শোকের নিলয়
মূর্ত্তিমান আজি তাহে আনন্দ উল্লাস!
ঘন অন্ধকারে আজি আলোক সঞ্চার,
সাহারা সন্তপ্ত নব বরষার জলে,
শ্যাপল্যাণ্ডে ফুটিয়াছে হাসি চন্দ্রমার—
হীরক খচিত চারু নীল নভ তলে।
অধিক কি—
ননদী বাঘিনী মুখে, চির পরাধীনা—
আজি সেই বঙ্গ-বধু তারাও স্বাধীনা!"

ভাবের মহিমায় এবং ভাষার সৌষ্টবে ইহা কবিত্বের একটী নিরাবিল অক্ষয় প্রস্রবণ।

"বীণা"য় প্রকাশিত তাঁহার "নিরন্ন কবি" শীর্ষক কবিতাটীও এই "দুর্গোৎসব" পর্য্যায়ের।

আমরা এই কবিতাটীর কএকটী অংশ মাত্র উদ্ধৃত করিতেছি। গুণগ্রাহী পাঠক ইহা হইতেই সমগ্র কবিতার রস গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং কবির উদ্দেশ্য বুঝিয়া লইবেন।

মণি-মুকুতার না পাই সন্ধান
দেখিনা ত্রিকাল হৃদয়ে ভাসে
অসি বরাভয় চামুণ্ডারূপিনী
মুমুণ্ডমালিনী গভীর হাসে।

* * * *

পোহাবে না এই তামসী রজনী
উঠিবে না রবি —— হবে না প্রভাত

* * * *

জনমের তরে নিপাত! —— নিপাত!

* * * *

দেখালো কল্পনে! সেই বিদ্যুজ্জ্যোতি
ভাগীরথী বক্ষে কেমনে ভাসে,
পর্ব্বত কন্দর আদি তৃণ দল
সে অট্ট হাসিতে কেমনে হাসে।

* * * *

স্বর্গীয় সৌরভে পূরিয়া দিক্
হাসিবে ভারত অমরা হাসি,
নয়ন ভরিয়া আশা মিটাইয়া
দেখিবে ভূলোক দ্যুলোক বাসী।

* * * *

দেখালো কল্পনে! সে মহাভারত
ভূতলে অতুল ত্রিদিব ছবি,
দেখিবি কেমনে? পাবি না দেখিতে
তুই ভারতের নিরন্ন কবি।"

এই কবিতাটী লিপি কৌশলে এবং ভাষা বিন্যাসের মনোহারিত্বে অপরূপ। অন্তঃ প্রকৃতির বর্ণনায়ও কবির কৃতিত্ব অপারসীম। আবার অনলবর্ষী প্রদীপ্ত ও জ্বালাময়ী কবিতা রচনা করিয়া ও তিনি আশ্চর্য্য ক্ষমতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। যাহাদের নিকট ১২৮৬ সালের "বীণা" আছে তাঁহারা সমগ্র কবিতাটী অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে পারেন।

১২৯৪ সনের চৈত্র সংখ্যা "নবজীবন" পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার "শিকার" শীর্ষক কবিতাটী পরবর্ত্তী কালে কোন গ্রন্থে স্থান পায় নাই। অতএব ইহা সাধারণ পাঠক মণ্ডলীর নিকট অবিদিত। গোবিন্দ দাস যখন ময়মনসিংহের অন্তর্গত সেরপুরের ভূম্যধিকারী, স্বর্গীয় হরচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের নিকট কার্য্য করিতেন তখন তাঁহার সঙ্গে মধ্যে মধ্যে শিকার করিতে বহির্গত হইতেন। উক্ত কবিতাটী সেই সময়ে রচিত হইয়াছিল। কবিতাটীর কেবল শেষ অংশ টুকু উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতেই পাঠকগণ বুঝিতে পারিবেন তাঁহার রচনায় কি কৃতিত্ব প্রকাশ পাইতেছে।

"এই ছাড়িলাম গোলা রক্ষা নাই আর,—
গর্জ্জিল রাইফেল "সেণ্ট্রাল ফায়ার"।—
একি হে মুহূর্ত্তে হায়, দেখি অচেতন প্রায়,
পতিত বিদীর্ণ বক্ষ মৃত্তের আকার;

গ্রাণ্ডডিউক সার্জ্জিয়াস্‌কে হত্যা করে। সম্রাট অবশেষে প্রজাদিগকে রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন এবং ডোমা বা জন সাধারণের একটী প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠার অনুমতি প্রদান করেন। এইরূপে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে ডোমার প্রতিষ্ঠা হয়।

বিপ্লবের কারণ।—ডোমা প্রতিষ্ঠার পর নিহিলিষ্ট দিগের অত্যাচার কতকটা প্রশমিত হইলেও প্রজাদের অসন্তোষের কারণ দূরীকৃত হয় নাই। প্রজারা যেরূপ অধিকার পাইবে বলিয়া আশা করিয়াছিল, সেরূপ কিছুই তাহারা লাভ করিতে পারে নাই। ডোমাতে ধনী ও সম্ভ্রান্ত লোকগণই প্রাধান্য লাভ করেন। সর্ব্বসাধারণ তাহাতে নিজেদের প্রতিনিধি প্রেরণের তেমন সুবিধা পায় নাই। তারপর ডোমার হাতে যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছিল, তাহাও অতি নগন্য। ডোমার অভিমত মন্ত্রি সভা ও জার ইচ্ছা করিলেই প্রত্যাহার করিতে পারিতেন। দেশ ব্যাপি প্রজাদের মধ্যে এই অসন্তোষের বিস্তৃতিই বর্ত্তমান রাষ্ট্র-বিপ্লবের প্রধান কারণ। ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় এই অসন্তোষ বহ্নি ধীরে ধীরে জ্বলিতেছিল। তাহা হইতে মধ্যে মধ্যে যে ধূম উত্থিত হইত স্বার্থপর মন্ত্রিগণ তাহা জারকে ভাল করিয়া বুঝিতে দেন নাই। অথবা সামান্য বায়ু বেগেই যে এই ভস্মরাশি উড়িয়া যাইয়া প্রবল দাবানলে পরিণত হইতে পারে, জার এতটা মনে করিতে পারেন নাই।

জাপানের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হওয়াতেও জনসাধারণ জার নিকোলাসের প্রতি বিতশ্রদ্ধ হইয়াছিল। তারপর জার নিকোলাসের অন্তঃকরণ ভাল হইলেও তাঁহার তেমন মানসিক বল ছিল না। তিনি অনেক সময়েই নিজের দুর্ব্বলতার পরিচয় দিয়াছেন। ফরাসী সম্রাট ষোড়শ লুইয়ের চরিত্র ও ভাগ্যের সহিত নিকোলাসের চরিত্র ও ভাগ্যের অনেকটা সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। উভয়েই শান্তিপ্রিয়, সরল ও কঠোরতার বিরুদ্ধবাদী; উভয়েই দুর্ব্বলচিত্ত, অস্থিরবুদ্ধি এবং অল্পাধিক পরিমাণে মন্ত্রিদিগের ক্রীড়নক ছিলেন। শান্তির সময় হইলে উভয়েই উপযুক্ত শাসনকর্ত্তা বলিয়া খ্যাত হইতে পারিতেন। সুশাসন, দয়া ও ন্যায়পরায়ণতায় উভয়েই ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারিতেন। কিন্তু বিদ্রোহী দিগের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, ইঁহাদের কেহই তাহা তেমন জানিতেন না। তবে সময় ও অবস্থার পরিবর্ত্তনে জার নিকোলাসের পরিণাম তেমন শোচনীয় হয় নাই। রুশিয়ার জনসাধারণ ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের ভীষণ কাহিনী ভুলিতে পারে নাই। তাহারা নিজেদের বেলায় যথাসম্ভব ধীরতা ও শৃঙ্খলতার পরিচয় দিতে পারিয়াছে। তাহারপর নিকোলাস ও তাঁহার পিতামহের হত্যার কথা মনে রাখাতেই পূর্ব্ব হইতে সাবধান হইতে পারিয়াছিলেন। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, যদি ক্রমে ক্রমে তাহার আরও একটুকু বিস্তৃতি সাধন করিতেন, তাহা হইলে হয়ত তাঁহাকে সিংহাসন চ্যুত হইতে হইত না।

বর্ত্তমান মহাসমরেও রুষ গবর্ণমেণ্ট প্রজার নিকট আশানুরূপ কার্য্যতৎপরতা দেখাইতে পারেন নাই। যুদ্ধের ফলে দেশে অর্থাভাব ও ভীষণ অন্নকষ্ট আরম্ভ হয়। কিন্তু মন্ত্রিগণ তাহার প্রতিকারের তেমন চেষ্টা পান নাই। ফলে বিগত কয়েক মাস ধরিয়া বুভুক্ষু নরনারী অসন্তুষ্ট হইয়া রাজশক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন ও দাঙ্গা হাঙ্গামা করিতে থাকে। ইহাও প্রকাশ যে রুশিয়ার ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রিগণের উপর জার্ম্মাণীর প্রাধান্য আছে বলিয়া জনসাধারণের বিশ্বাস জন্মে এবং তাহাতে তাহারা গবর্ণমেণ্টের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে। মন্ত্রিগণ জার্ম্মেণীর সহিত পৃথক সন্ধির পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু প্রজাগণ তাহা মোটেই পছন্দ করিত না।

সর্ব্বশেষে আর একটী কারণে জনসাধারণ জার নিকোলাসের উপর একেবারেই শ্রদ্ধাহীন হইয়া পড়ে। গ্রেগরি রাসপুটিন নামক জনৈক ধর্ম্মযাজক দৈবশক্তিবলে বিনা ঔষধে সকলপ্রকার কঠিন রোগ আরাম করিতে পারেন বলিয়া প্রকাশ করেন। এই কথায় বিশ্বাস করিয়া জার স্বীয় পুত্রের চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে নিযুক্ত করেন। এই সুযোগে রাসপুটিন জার ও তাঁহার মন্ত্রিগণের উপর অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেন। প্রজাদিগের বিশ্বাস জন্মে যে এই ব্যক্তি জার্ম্মেণীর পক্ষ সমর্থনকারী এবং তাহারই পরামর্শে মন্ত্রিগণ তাহাদের অন্নকষ্ট নিবারণের

সন্ধ্যাবেলা নন্দ দিদির বাড়ী ইছাপুরে পৌঁছিল। লক্ষ্মীমণি সন্ধ্যার দীপ দিয়া ছেলে মেয়ে গুলিকে খাওয়াইতেছিল, বাহির হইতে কে ডাকিল "লক্ষ্মী"। লক্ষ্মী হাত ধুইয়া বাহিরে আসিয়া দেখিল, তাহার বাপের দেশের নিধি মুখুয্যে একটী ছেলেকে সঙ্গে করিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া আছে। মুখুয্যে বলিলেন "এটি তোমার ভাই। তোমার মা মরেছে, তাই তোমার কাছে এসেছে।" "এস" বলিয়া লক্ষ্মী শোক-সন্তপ্ত বালককে বুকের কাছে টানিয়া লইল। নন্দ দিদির বুকে মুখ রাখিয়া একবার খুব কাঁদিয়া মনের রুদ্ধ বেদনা প্রকাশ করিল।

পরদিন সকাল বেলা মুখুয্যে মশায় বলিলেন "নন্দ এখানে থা'ক। কেমন রে নন্দ, দিদির কাছে থাকতে পার'বনে।" নন্দ মাথা নাড়িয়া সম্মতি জানাইল।

দুপুর বেলা লক্ষ্মীর স্বামী মণিকলাল দত্ত বাড়ী আসিয়া লক্ষ্মীর কাছে অপরিচিত বালকটীকে দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য হইল। লক্ষ্মী বলিল "এটি আমার ভাই, এখানে থাকবে বলে এসেছে"। মাণিক বলিল "বেশ ত"।

মাণিকলাল লোকটী কিছু কৃপণ। বাজারে তাহার একটী ছোট খাটো রকমের দোকান আছে। দোকানের আয় ও বাড়ীর তরিতরকারী, বাঁশ ইত্যাদি বেচিয়া সংসার চালায়। সংসার ও তেমন বড় নয়; স্ত্রী, একটী সাত বৎসরের মেয়ে আর একটী তিন বৎসরের শিশু পুত্র। মাণিক অনেক দিন যাবত অল্প বেতনে একটি চাকর খুঁজিতেছিল। তাই নন্দকে দেখিয়া এত সহজে বলিল "বেশ ত।"

লক্ষ্মীমণি নন্দকে একখানা কাপড় ও একটী পিরাণ আনাইয়া দিল। মাণিক তাহা দেখিয়া একটী বড় রকমের ভ্রুকুটী করিল, কিছু বলিল না। পত্নীকে সে কিছু ভয় করিত। মাণিক নন্দকে একছিলিম তামাক সাজিতে আদেশ করিয়া হিসাবের খাতা লইয়া বসিল। নন্দ রান্নাঘরে যাইয়া দিদির কাছে আগুন চাহিল। দিদি বলিল "কেনরে নন্দ আগুন দিয়ে কি হবে?" নন্দ বলিল "দত্ত মশায় তামাক খাবেন।" "তোকে বলেছে কেন? যা'ত মা সুরু উঁকে একছিলিম তামাক দিয়ে আয়!" মেয়েকে তামাক আনিতে দেখিয়া মাণিক বলিল "নন্দ কোথায়?" মেয়ে বলিল "মার কাছে বসে কি কথা কচ্ছে।" সুরু চলিয়া গেল। মাণিকলাল বুঝিল নন্দ ক্রমে ২ লক্ষ্মীর হৃদয় অধিকার করিতেছে। এ তাহার পক্ষে বড় সুবিধার কথা নহে।

দিন কয়েক পরে একদিন আহারে বসিয়া মাণিক বলিল "নন্দ এখন কি করবে, এমনি করে ত আর চিরকাল চলবে না।" লক্ষ্মী বলিল "আমিও ভাবছি তাই, আচ্ছা কাল তাকে একবার রামঠাকুরের পাঠশালায় নিয়ে যেও না হয়?" মাণিক ভাবিল তবেই হয়েছে, বলিল "দেখ লেখে পড়ে আর কি হবে? আজকাল যে দিন পড়েছে, তাতে লেখা পড়ায় কিছু কাজ হয় না; আমি ভাবছি ওকে দোকানে নিয়ে কিছু কিছু করে কাজকর্ম্ম শেখাব।" "যা ভাল বোঝ কর, তবেও ছেলে মানুষ পেরে উঠবে কিনা ভাবছি।" লক্ষ্মী স্বামীর স্বভাব জানিত তাই এই কথা বলিল।

(২)

পরদিন হইতে নন্দ সময় মত দোকানে যাইতে আরম্ভ করিল। কোন দিন মাণিক সঙ্গে থাকিত, কোনদিন থাকিত না। পথে দেখিত ছেলেরা সব ঘুড়ি লাটাই নিয়া খেলা করিতেছে; তাহার হৃদয় ফাটিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস আসিত, কখন কখন দুই এক বিন্দু তপ্ত অশ্রু গড়াইয়া পড়িত। ভাবিত 'কি সুখের দিনই তাহার গিয়াছে'। সে সব ভুলিয়া যাইত। বাজার-যাত্রিগণ তাহার অতীত সুখস্বপ্ন ভাঙ্গিয়া দিত। ঘরের রোয়াকে পা দিতে না দিতেই মাণিকের কণ্ঠস্বর তাহার কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিত "কিরে নন্দ তুই আমার দোকান বন্ধ করবি নাকি? কত লোক যে ফিরে গেল, এই ক্ষতিপূরণ দেয় কে? বসে বসে খাচ্ছ আর বয়ে যাচ্ছ, নয়? যা, যা এই তেলের বোতল কটা ভরে দে।" নন্দ জোর করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস চাপিয়া তেল ভরিতে চলিল।

একদিন তাড়াতাড়ি ভরিতে যাইয়া কতটুকু তেল মাটীতে পড়িয়া গেল; দেখিয়া মাণিকলালের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল; চীৎকার করিয়া বলিল "হতভাগা, দেখ্‌ত কি করলি, বের এখান থেকে।" নন্দ এককোণে দাড়াইয়া কাঁপিতে লাগিল। মাণিকলাল অতি কষ্টে ধূলি মিশ্রিত তৈল উঠাইয়া বলিল "হাঁ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকলে চলবে না, এই বস্তা নিয়ে বাড়ী চ।" এই বলিয়া নন্দের

কিয়ৎকাল দেশ ভ্রমণের পর স্বাস্থ্য ফিরিয়া পাইলেন। কিন্তু এখন হইতে প্রায়ই শিরঃপীড়ায় ভুগিতে লাগিলেন। অবশেষে শরীর এতই খারাপ হইয়া পড়িল যে উপায়ান্তরবিহীন হইয়া ১৮৭৯ সালে কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এখন হইতে ইউনিভার্সিটী হইতে প্রাপ্ত বার্ষিক একশত কুড়ি পাউণ্ড মুদ্রা মাত্র পেনসেনের উপর নির্ভর করিয়াই তাহাকে জীবন যাপন করিতে হইতে লাগিল। স্বাস্থ্য লাভের জন্য কখন ও সুইজারলেণ্ডের পর্ব্বত মালায় স্থাপিত সেণ্ট মরিটজ, সিলস মেরিয়া, কখনও ইটালীর অন্তর্গত ভেনিস, জেনোয়া, নাইস ইত্যাদি নানাস্থানে, কখনও হোটেলে, কখনও কৃষকের গৃহে একাকী জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু, কোথায়ও শান্তি পাইতেছিলেন না। অতি কষ্টে নিতান্ত মিতব্যয়ী ভাবে জীবন যাপন করিতেন। যখন জেনোয়া নগরে বাস করিতেন, তখন স্পিরিট ল্যাম্পের সাহায্যে নিজ হস্তে সামান্য রকমের খাদ্য প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেন। নির্জ্জনেই অধিক সময় অতিবাহিত হইত, প্রভাতে একাকী সমুদ্র তীরে বা পার্ব্বত্য প্রদেশ সমূহে নোট বুক হস্তে কর্ত্তন করিতেন, রৌদ্রের উত্তাপ বৃদ্ধি হইলে কখনও বিশ্রাম করিতেন, কি যেন চিন্তায় সকল সময়ই বিভোর থাকিতেন, যখন যাহা মনে হইত নোট বুকে লিখিয়া রাখিতেন। ক্রমে ক্রমে Human All Too Human, Gay Science, Thus Spake Zarathustra, Beyond Good and Evil, The Will to Power ইত্যাদি অনেকগুলি গ্রন্থ প্রণয়ন করিলেন, কিন্তু সাধারণে তাহার প্রতিপত্তি কিছুই হইল না। বরং তাহা পাঠ করিয়া বন্ধু বান্ধব সকলেই বীতশ্রদ্ধ ও বিরক্ত হইয়া উঠিল, ক্রমে ক্রমে প্রায় সকলেই তাহার সংশ্রব পরিত্যাগ করিল, অবশেষে প্রকাশকও গ্রন্থাদি নিজ ব্যয়ে মুদ্রিত করিতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। প্রথমতঃ, তাহার গ্রন্থাদিতে খ্রীষ্টধর্ম্মের প্রতি বিষম আক্রমণ দৃষ্ট হইত, তদুপরি তাহার লেখার রীতি ও ভঙ্গিমাই এমন নূতন ধরণের ছিল যে তাহা অনেকের নিকটই দুর্ব্বোধ্য বোধ হইত। অবস্থা শেষে এমন হইয়া দাঁড়াইল যে তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ Thus Spako Zarathustra চতুর্থ খণ্ড তিনি নিজ ব্যয়ে চল্লিশ খানা মাত্র মুদ্রিত করিলেন, এবং খুঁজিয়া সাতজন বন্ধু ও আত্মীয়ের কাছে তাহা প্রেরণ করিলেন। সাধারণের ব্যবহারে তিনি দিন দিনই ক্ষুণ্ণ ও ম্রিয়মান হইয়া পড়িতেছিলেন, কার্য্যে উৎসাহও হ্রাস প্রাপ্ত হইতে লাগিল।

জীবনের শেষ ভাগে যেন জনসাধারণের তুচ্ছতাচ্ছিল্যের ভাব কমিয়া আসিতে লাগিল। সুবিখ্যাত ফরাসী ঐতিহাসিক টেইন, ডেনিশ লেখক ব্রেণ্ডেস ও সুইডেনের বিখ্যাত নাট্যকার ষ্ট্রিণ্ডবার্গের দৃষ্টি তাহার গ্রন্থাদির প্রতি আকৃষ্ট হইল। তাহার সমধ্যায়ী বাল্যবন্ধু প্রফেসার পল ডুসেন (উত্তর কালে যিনি উপনিষদের দর্শন তত্ত্বের আলোচনা করিয়া জগৎ বিখ্যাত হইয়াছেন) তাহার গ্রন্থের এক সংস্করণ ক্রয় করিবার জন্য তার বন্ধুবিশেষ হইতে তাহার নিকট দুই হাজার ফ্রাঙ্ক মুদ্রা প্রেরণ করিলেন। মেডাম মার্সলিনস নামক জনৈক বিদুষী রমণী ১০০০ এক হাজার ফ্রাঙ্ক প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তখন তাহার কর্ম্ম জীবনের শেষ অবস্থা প্রায় সমাগত। ১৮৮৯ সনে তিনি অকস্মাৎ উন্মাদরোগগ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাহার বন্ধুবর প্রফেসার ওভারবেক তাহাকে সেই অবস্থায় টিউরিন হইতে বেছিল নগরে লইয়া আসেন। তাহার বৃদ্ধ মাতা তখন ও জীবিত, তিনি তাহাকে জেনা নগরে লইয়া যান ও সেখান হইতে ১৮৯০ সনে নৌমবার্গে স্বগৃহে আনয়ন করেন। তিনি আর আরোগ্য হন নাই। ১৯০০ সনে উইমার নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাহার উন্মাদকতার কারণ এখনও নির্ণয় হয় নাই। যাহাই হউক, তাহার শোচনীয় পরিণামের বিষয় ভাবিয়া দুঃখিত না হইয়া থাকা যায় না। নিট্‌জের বিবাহ সম্বন্ধে অমত ছিল না—দুই বার দুইটী রমণীর পাণিপ্রার্থীও হইয়াছিলেন—দুই বারই প্রত্যাখ্যাত হন, শেষে আর বিবাহের দিকে দৃষ্টি করেন নাই। একমাত্র জ্ঞানচর্চ্চাতেই তাহার জীবন অতিবাহিত হইয়াছে। চরিত্র নির্ম্মল, স্বভাব সরল ছিল,—তাহার মহানিন্দুকও এ বিষয়ে তাহার বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারে নাই।

পূর্ব্বাপরই নিট্‌জের নিজ প্রতিভা ও শক্তির উপর পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। ১৮৮৩ সনে নাইস নগরে অবস্থান কালীন তিনি তাহার প্রতিবেশীগণকে কথাচ্ছলে বলিয়াছিলেন,

চলিতে পারে। রাস্তার পাশে, পতিত মাঠে ইত্যাদিতে অনেক পরিমাণে শঠী উৎপন্ন হইয়া জঙ্গলে পরিণত হয় তাহা সংগ্রহ করিয়া চালান দিলে পল্লীবাসীরা দু পয়সা সহজেই উপার্জ্জন করিতে পারে। খুলনা, বরিশাল, নোয়াখালী চট্টগ্রাম জেলার লোকে সুপারি গাছের বাকল পূর্ব্বে ফেলিয়া দিত। ব্রহ্মদেশ হইতে "মগেরা" আসিয়া সেই বাকলের মধ্যস্থিত যে শুভ্র সুন্দর একটী পাতলা স্তর আছে তাহা কিনিতে আরম্ভ করায় তথায় পল্লীবাসীদের অর্থাগমের একটী সুন্দর ও সহজ উপায় হইয়াছে। মগেরা যে দাম দেয় তাহাতেই পল্লীবাসী দিগকে এই গুলি বিক্রয় করিতে হয়। আমরা এরূপ অলস প্রকৃতি যে ব্রহ্মদেশে যাইয়া তাহার কোন ব্যবসা নিজেরা খুলিতে পারি না। এই শুভ্র-স্তর দ্বারা চুরুটের আবরণ প্রস্তুত হয় সুতরাং মগগণ এক আনা, ছয় পয়সা সের কিনিয়া উহা তথায় চালান দিয়া তাহা হইতে যথেষ্ট লাভবান হয়। মগেরা ঐ স্তরকে "খুঁই" বলিয়া থাকে। বরিশাল প্রভৃতি জেলায় গৃহস্থের বাড়ীতে অনেক পরিমাণে সুপারি গাছ জন্মায়। কেননা লোনা দেশে সুপারি এবং নারিকেল গাছ সহজে এবং বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। বরিশাল জেলার অন্তর্গত ভোলা মহকুমায় কার্য্যোপলক্ষে থাকা কালীন আমি নিজে তদন্ত করিয়া জানিতে পারি যে এক বৎসরে তথায় প্রায় একলক্ষ টাকার "খুঁই"—বিক্রয় হইয়াছিল। ভোলার নিকটবর্ত্তী ৫।৭।১০ মাইলের মধ্যে যে সব পল্লী আছে, সেই সব গ্রাম হইতেই মাত্র ঐ "খুঁই" আসিয়া থাকে। কারণ বেশী দূর হইতে আনিতে গরুর গাড়ী ভাড়া ইত্যাদির জন্য যে খরচ পরে তাহাতে যে দামে বিক্রয় হয় খরচ পোষায় না। তাহা হইলে বুঝিতে পারা যাইতেছে যে Transport এর সুবিধা অর্থাৎ স্বল্প খরচে দূরবর্ত্তী গ্রাম হইতে এই "খুঁই" আনিবার ব্যবস্থা করিতে পারিলে পল্লীবাসীরা বহু পরিমাণে লাভবান হইতে পারিবে, তাহার আর কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। এখনও দূর গ্রামের "খুঁই", গাছ হইতে পড়িয়া নষ্ট হয়।

শ্রীঅনঙ্গমোহন লাহিড়ী।

বাঙ্গালীর কৃতিত্ব।

ভারতের অন্যান্য জাতি সকলের সহিত মিলিয়া একটা বিশাল ভারতীয় জাতির অঙ্গ হইবার আকাঙ্ক্ষা আমাদের হৃদয়ে আজ কাল এত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, রাজপুতনা, মহারাষ্ট্র, দাক্ষিণাত্য প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইতে বাঙ্গালী যে পৃথক্ একথা মনে করিবার ইচ্ছা আমাদের মোটেই হয় না। তথাপি একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, এখন এক রাজার অধীন হইয়াছি বলিয়া ইহাদের সহিত একটা একত্ব যদিও আমরা দাবী করিতে পারি, তথাপি চিরকালই এ অধিকার আমাদের ছিল না। ভাষায়, সমাজে, ইতিহাসে সর্ব্বত্রই ইহাদের সহিত তুলনায় নানা রকমের পার্থক্য আমাদের রহিয়াছে; এমন কি কখনও কখনও, —যেমন মহারাষ্ট্রীয়দের সহিত আমাদের বিরোধও ঘটিয়াছে। সুতরাং আমরা যতটা একতা হইয়াছে বলিয়া মনে করি, ততটা হইয়াছে কিনা সন্দেহ।

তবে, এই আধুনিক রাষ্ট্রীয় একতা ছাড়া একটা প্রাচীনতর গভীরতর একতাও আছে বলিয়া আমরা মনে করি; সেটী সমগ্র হিন্দু জাতির ধর্ম্ম, সমাজ, ও হিন্দুর একান্ত নিজস্ব বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য। এ সমস্তই হিন্দু মাত্রেই উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছে, সুতরাং সমস্ত হিন্দুই একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ।

এই ডোরের বন্ধন ছেদন করিয়া ভারতের অন্যান্য জাতি সকল বাঙ্গালীকে আপন বলিয়া অস্বীকার করিতে পারিবে না, সত্য; কিন্তু হিন্দুর প্রাচীন-গৌরব নিয়া গৌরব করিবার অধিকার বাঙ্গালীর কতটুকু, বাঙ্গালীর তাহা বিচার করা উচিত।

প্রকৃত শ্রদ্ধার সহিত কোনও এক ধর্ম্মকে নিজের আধ্যাত্মিক পরমার্থ লাভের এক মাত্র পন্থা মনে করিয়া নিজের পৈতৃক ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যদি কেহ তাহা গ্রহণ করে, তবে তাহার বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার থাকিতে পারে না। কিন্তু তাই বলিয়া সেই ধর্ম্মের সংসৃষ্ট সমস্ত বিষয়ই সে তাহার পূর্ব্ব পুরুষের কৃত মনে করিয়া বড়াই করিতে পারে না। কোন হিন্দু বা মুসলমান যদি খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া মনে করে, সমস্ত খ্রীষ্টান ইতিহাস

নাই। সুতরাং ঐতিহাসিক কৌতূহল চরিতার্থ করা ভিন্ন নব্যন্যায় আমাদের কোন উপকারে আসিবে কি না সন্দেহ, —তাহার কাজ ইউরোপীয় লজিক বা তর্কশাস্ত্রই ভাল করিবে, কিন্তু সাংখ্যবেদান্ত স্বতন্ত্র দার্শনিক মত হিসাবে জগতে টিকিয়া থাকিবে।

বৈষ্ণবধর্ম্ম ও কৌলিন্য প্রথার আবির্ভাব যখন হইয়াছিল, তখন দেশের কোন উপকার হয় নাই, এমন নহে। কিন্তু এত সহজে এ উভয়ের মধ্যেই কদাচার ঢুকিয়াছিল এবং এত অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদের পরিবর্ত্তন ও পরিবর্জ্জন প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িয়াছে যে, চারিদিক ভাবিয়া কোন স্থায়ী কাজ বাঙ্গালী করিতে পারে, ইহা হইতে তাহা মোটেই প্রমাণ করা যায় না। এখনকার দিনে যেমন কত শিল্পসমিতি, সমবায়সমিতি, লিমিটেড্ কোম্পানী প্রভৃতি আমরা গড়ি, এবং ইচ্ছায় হউক, অনিচ্ছায় হউক, সেগুলিকে আবার ভাঙ্গি,—মনে হয়, অতীত ইতিহাসেও তার চেয়ে খুব বড় কাজ বিশেষ কিছুই আমরা করিতে পারি নাই।

বাঙ্গালার অতীত রাষ্ট্রীয় ইতিহাস উদ্ধারের খুবই চেষ্টা হইতেছে; এবং অনেক রাজারাজরার নামও আমরা পাইতেছি কিন্তু কয়টী পরগণা নিয়া তাঁহাদের রাজত্ব ছিল এবং এখনকার বড় বড় জমিদারের জমিদারীর চেয়ে সে সব রাজ্য কত বড় ছিল, সব সময় তাহা ঠিক করা যায় না। কেহ কেহ বলেন, এই সব রাজাদের কাহারও কাহারও আমলে প্রজারা প্রচুর স্বায়ত্বশাসন ভোগ করিত, এমন কি, কোন কোন রাজা প্রজাগণ কর্ত্তৃকই নির্ব্বাচিত হইয়াছিল। সেসব অনেক প্রাচীনকালের কথা। এসব তথ্যের মূল্যবিচার করিবার অধিকার রাখি না। কিন্তু আমরা জানি, আজ যেমন বাঙ্গালী বহুল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একটা পরীক্ষা পরিচালনে অসমর্থ হইয়া এক জন সাহেবের করুণার ভিখারী হইয়াছেন, কিঞ্চিদধিক দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে তেমনই রাজ্যশাসনের জন্য বাঙ্গালী ইংরেজের সাহায্য চাহিয়াছিল।

অতীত কালের একটা বিশাল সাহিত্যের উদ্ধারও ঐ দেশে হইতেছে। পৃথিবীর অন্যান্য সাহিত্যের তুলনায় সে সাহিত্যের মূল নির্দ্ধারণের চেষ্টা এখনও হয় নাই। ইহাতে বাঙ্গালীর নিজস্ব কতটুকু আর কতটুকু পশ্চিম ভারতে উৎপন্ন রামায়ণ মহাভারতের নিকট ধার করা, তাহাও বিচার করিতে হইবে। তাহা করিলে বোধ হয় দেখা যাইবে, বাঙ্গালী শনি-সত্যপীরের পাঁচালী যত সৃষ্ট করিয়াছে, কালিদাস-ভবভূতি বা ব্যাস-বাল্মীকির সাহিত্যের মত সাহিত্য তত পারে নাই।

সুতরাং অতীত নিয়া গৌরব করিতে হইলে, হস্তী চিকিৎসাকে একটি মস্ত জিনিষ মনে করা ছাড়া আমাদের আর উপায় নাই। হিন্দু বলিয়া সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের একটা সাধারণ গৌরব আমরা করিতে পারি; তা ছাড়া বাংলা দেশের একান্ত নিজস্ব জিনিস বড় বিশেষ কিছু নাই। কেহ কেহ বলেন, উড়িষ্যায় যে স্থাপত্য বিদ্যার মহৎ চিহ্ন রহিয়াছে, বাঙ্গালীরই মাথায় তাহা উদ্ভূত হইয়াছিল। তাহা কতদূর সত্য, বিচার করিবার ক্ষমতা রাখিনা। কিন্তু বাংলা ভাষা যেখানে কথিত হয়, সেই প্রকৃত বঙ্গদেশে তাহা নির্ম্মিত হইতে পারে নাই কিংবা নির্ম্মিত হইলেও স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই, ইহা ত বাঙ্গালীর লক্ষণ নহে!

সুতরাং অতীতের বড়াই করিয়া, পূর্ব্ব পুরুষের মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া জগতের সম্মুখে নিজেকে বড় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা বাঙ্গালীর পক্ষে তত শোভন নহে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অতীত না থাকিলেই ভবিষ্যৎ ও থাকিবে না, এমন নয়। চেষ্টা করিয়া শক্তিলাভ করিতে হয়; সে চেষ্টা পূর্ব্বে কেহ করে নাই বলিয়া এখনও কেহ করিতে পারে না; এমন নহে। কিন্তু বাঙ্গালী যে মনে করিবেন, সমস্ত মহৎ কাজ করিবার শক্তি তিনি পূর্ব্ব পুরুষের নিকট পাইয়াছেন এবং তাহার ভিতরে যে শক্তি রহিয়াছে, এব কাজে লাগাইয়া দিলেই তিনি তাহা করিতে পারিবেন, ইহা ঠিক নয়। তাহাকে সাধনা করিতে হইবে, তপস্যা করিতে হইবে, ধীরে ধীরে শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে; তবে ত তিনি একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের প্রত্যাশা করিতে পারিবেন। কিসে পৃথিবীতে বড় হওয়া যায়, কিসে মহৎ কাজ করা যায় জগতের ইতিহাসে তাহার ইঙ্গিত রহিয়াছে।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

গাড়ী ছাড়িতে বড় দেড় হইতে লাগিল আমরাও ভারী দিকসিক্ বোধ করিতে লাগিলাম, এমন সময় সুন্দর ষ্টেট ইউনিফরম পরিহীত একটী সুশ্রী যুবক গাড়ীর সহস্র লোক উপেক্ষা করিয়া স্মিত মুখে বন্ধু ভাবে আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইয়া আমাদের নাম ধাম পিতার নাম ইত্যাদি জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তর গুলি নোট করিতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের এ ট্রেণ খানিতে বোধ হয় আমরাই কয়টী বাঙ্গালী ছিলাম। সুতরাং আর বুঝিতে বাকী রহিল না—কেন আমাদের এ সম্মান? মুষ্টিমেয় অপরিণত মস্তিষ্ক কয়টী যুবকের কার্য্যতায় সমস্ত বাঙ্গালী জাতির উপর কি কলঙ্কের ছায়া পাতই না হইয়াছে! প্রশ্নোত্তর গুলি পুলিস আফিসে গেল। অফিসারটী গাড়ীর সম্মুখেই দাঁড়াইয়া ছিলেন, আফিস হইতে আমাদের লাইন ক্লিয়ার আসিল, তারপর গাড়ী ছাড়িয়া দিল; আমরাও হাফ্ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমরা ভারতের নন্দন-কানন—জয়পুরে উপনীত হইলাম।

গাড়ীতেই শুনিয়াছিলাম জয়পুরে আগন্তুক ভদ্র লোক দিগের বাসের জন্য সুন্দর একখানি নূতন বাড়ী হইতেছে এবং ইহাতে থাকা মেলার বন্দোবস্তাদি সমুদয়ই ষ্টেট হইতে হইতেছে। ষ্টেসনে পঁহুছিয়া কয়েকটী বাঙ্গালী বালকের সাক্ষাৎ লাভে তাহাদিগকে জিজ্ঞাসায় ওকথার যথার্থ্য সপ্রমাণ হইল। আমরা গোপালজিউর প্রসাদ উদ্দেশ্যে মস্তকে ধারণ করিলাম এবং আমাদের ফিটন মেমোরিয়াল অভিমুখে হাঁকাইতে বলিয়া দিলাম।

জয়পুর নগর চারিদিকে উচ্চ প্রাচীর পরিবেষ্টিত। তন্মধ্যে সাতটী আগম ও নিগম দ্বার। প্রাচীরের এই বেষ্টনী মধ্যে রাজ প্রাসাদ, আফিস আদালত, বাজার দোকান পসার যত কিছু। রাত্রি ৯ টার তোপের সঙ্গে দ্বার গুলি রুদ্ধ হয়, আবার ভোর সারে চারিটায় উদঘাটিত হয়। দরজা গুলি বন্ধ হইলে আর নগরে গমনাগমনের কোন উপায় থাকেনা। কিন্তু ট্রেনে রাত্রি সর্ব্বদাই গমনাগমন করিয়া থাকে; তাই আগন্তুক দিগের জয়পুরে থাকিবার অসুবিধা দূরীকরণ মানসে বর্ত্তমান মহারাজা আমাদের সর্ব্বজন প্রিয় ভূতপূর্ব্ব সম্রাট এডওয়ার্ডের স্মৃতি রক্ষা কল্পে প্রস্তর মূর্ত্তি বা তদনুরূপ কোন প্রকার বহ্বাড়ম্বরে অর্থব্যয় না করিয়া নগরের বহির্ভাগে বহু অর্থব্যয়ে এই পরম রমণীয় বাড়ী খানি নির্ম্মাণ করিয়া দিতেছেন। ইহাতে সম্রাটের স্মৃতিও যুগাযুগান্তরে যেমন রক্ষিত হইবে অপরিচিত আগন্তুক, দেশীয় পর্য্যটক গণের থাকার অসুবিধাও তেমনই দূর হইবে। এইরূপ ভাবে স্মৃতি রক্ষা করিতে আমাদের দেশে অর্থশালী ব্যক্তিদের কয়জনে জানেন? আমরা যখন গিয়াছিলাম বাড়ী খানি তখনও সম্পূর্ণ হয় নাই. উপরে পশ্চিম দিকে মাত্র চারি খানি ঘর হইয়াছে; নীচেও অনেক ঘরের কাজ সমাধা হয় নাই। সমস্ত বাড়ী খানিই দোতালা হইবে জানিয়া আসিয়াছি। এই বাড়ী সম্পূর্ণ হইলে উপরে ও নীচে পঞ্চাশ খানি প্রশস্ত কক্ষে সুখে সচ্ছন্দে দুইশত লোকের একত্রে স্থান সমাবেশ হইতে পারিবে।

আমাদের গাড়ী খানি মেমোরিয়ালের প্রশস্ত ফটকের সম্মুখে উপস্থিত হইবা মাত্র ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং বাহির হইয়া আসিয়া আমাদের মাল পত্র উপরে লইয়া যাইতে মেমোরিয়ালের ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন। তাহারা আমাদের মাল পত্র দোতালায় একটী সুপ্রশস্ত কক্ষে রক্ষা করিয়া আমাদিগকে ঘর দেখাইয়া দিল। আমরা ঘরে যাইয়া বিশ্রামের পথ খুজিতেছি, এমন সময় ম্যানেজার সাহেব আসিয়া আমাদের সহিত শিষ্টাচার সূচক আলাপ আপ্যায়ন করিয়া গেলেন। এখানে পাচক ব্রাহ্মণ আছে; আহার্য্য জিনিষপত্র কিনিয়া দিলে বা মূল্য দিলে ইহারা সংগ্রহ-পূর্ব্বক সমুদয় তৈয়ারি করিয়া দিয়া থাকে। ইহাদিগকে ।/০ এবং গাইড দিগকে ৸০ মেমোরিয়ালের বন্দেজী নিয়মানুসারে দৈনিক পারিশ্রমিক, দিতে হয়। কক্ষ গুলির ভাড়া দৈনিক ॥০ আট আনা হইতে দুই টাকা পর্য্যন্ত আছে।

জয়পুর চির দিনই বাঙ্গালী হিন্দুর প্রধান্য ছিল। বর্ত্তমান মিনিষ্টার মুসলমান, সেই সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় মুসলমান প্রাধান্য স্থাপিত হইতেছে। কিন্তু এখানে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে পরস্পরে কোনরূপ বিদ্বেষ থাকা জানা গেল না। যদিও শ্রদ্ধেয় সংসার বাবুর পুত্র রায় বাহাদুর অবিনাশচন্দ্র সেন মহারাজের প্রাইভেট সেক্রেটারী এবং বাবু রামচন্দ্র সেন মিউনিসিপাল কমিটীর প্রেসিডেণ্ট তবুও বাঙ্গালীর আর সে প্রাধান্য নাই, এখন বাঙ্গালীর সংখ্যাও অনেক হ্রাস হইয়াছে। পূর্ব্বে কোন বাঙ্গালীর গৃহে নিমন্ত্রণে মেয়ে পুরুষে চারিশত

বাহির হইয়া পড়িল। পথে কত জন তাহাকে দেখিয়া নাক সিটকাইয়া, কতজন হাসিয়া বেশ একটু আমোদ করিল। বৌ ঝিরা কলসী কাঁকে জল আনিতে যাইতে যাইতে ঘোমটা ফাঁক করিয়া তাহাকে দেখিল ও পরস্পর গা টিপাটিপি করিয়া ফিসফিস করিয়া কত কি বলিল—তাহা সে মোটেই লক্ষ্য করিল না।

মনিয়া তখন গোয়াল ঘর হইতে ধামায় করিয়া গোবর গুলি ফেলিয়া দিয়া সবে মাত্র ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছে। রহিম পশ্চাত হইতে ডাকিল মনিয়া! মনিয়া ফিরিয়া দাড়াইল। অগ্রসর হইয়া রহিম দেখিল—পূর্ব্বে তাহাকে দেখিলে চিত্ত-চাঞ্চল্য জনিত মনিয়ার মুখের যে পরিবর্ত্তন ঘটিত তাহা আর নাই, সে একদৃষ্টে রহিমের দিকে চাহিয়া রহিল—সে দৃষ্টিতে না ছিল প্রাণ, না ছিল ভালবাসা—ছিল কেবল ঘৃণা ও বিরক্তি। মনিয়ার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির সম্মুখে রহিমের মাটিতে মিশিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছিল। সংসারের প্রতি একটা অবিশ্বাসে তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। মনিয়াও তবে তাহাকে ঘৃণা করে! হা অদৃষ্ট!

রহিম ফিরিয়া গেল। যাইতে যাইতে পথে হোসেনের সঙ্গে দেখা হইল। হোসেন তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিল না। শিশ দিয়া যুবক মহলে সুপরিচিত একটা গানের সুর ভাজিতে ভাজিতে সে পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল।

সে দিন রাত্রে যখন চন্দ্র সুধার ধারা বর্ষণ করিতেছিল আর রহিমের হৃদয়ের গুমট অন্ধকার জমাট বাধিতেছিল সেই সময় হোসেনের সঙ্গে মনিয়ার বিবাহ হইয়া গেল। পরদিন গ্রামবাসীরা সবিস্ময়ে দেখিল রহিমের শূন্য কুটীর খাঁ খাঁ করিতেছে।

(২)

গলা টিপিয়া ভাই ভাইকে মারিয়া ফেলিতে পারে, ছলে বলে কলে কৌশলে বন্ধুকে গৃহত্যাগী করা চলে, কিন্তু মানুষের বুকের ভিতর যে একজন আছেন, তাঁহাকে টুটি টিপিয়া মারিয়া ফেলা চলে না। চুরির অপরাধে সকলে রহিমকে দোষী সাব্যস্ত করিল, মনিয়ার সঙ্গে তাহার বিবাহ না হইয়া হোসেনের সঙ্গে হইল। দুঃখে ক্ষোভে রহিম গৃহত্যাগী হইল। সকলই হইল—কিন্তু হোসেনের মনে সুখ হইল না।

বিবেকের দংশন, মানসিক অশান্তি সর্ব্বদাই তাহাকে এতদূর ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল যে আর্থিক স্বচ্ছলতা, রূপসী পত্নী মনিয়া, কিছুই তাহাকে শান্তি প্রদান করিতে পারিল না। এই সকল অরুন্তুদ দুঃখ ব্যথার কথা যে কাহারও নিকট বলিয়া তাহার মনের ভার একটু লাঘব করিবে তাহারও সুবিধা নাই—আর বলিবেই বা সে কি?

যে দিন মণ্ডলের অপহৃত টাকার দায়ে রহিমের পরিত্যক্ত বাড়ী জমি নিলাম হওয়ার কথা—তাহার পূর্ব্বদিন রাত্রে হোসেন স্বপ্ন দেখিল—বৃদ্ধ নাজির মণ্ডলের প্রেতাত্মা তাহার শিয়রে দাঁড়াইয়া বলিতেছে "বল টাঁকা বাহির করিয়া দিবে কি না।" চীৎকার করিয়া হোসেন শয্যার উপরে উঠিয়া বসিল—তাহার চীৎকারে মনিয়া জাগিয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল "কি হইয়াছে—এমন চীৎকার করলে যে?" ভীত হোসেন বুঝিল উহা স্বপ্ন। কিন্তু ভয়টা দূর হইল না। পত্নীর কথার উত্তরে সে কহিল "মণি, আমার সুখ শান্তি সকলই গিয়াছে। আমি তোমাকে পাইয়া একদিনের তরেও সুখী হইতে পারি নাই। শয়নে স্বপনে নিদ্রায় জাগরণে কেবলই পুড়িয়া মরিতেছি। বিবেকের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া হৃদয়টা ক্ষতবিক্ষত হইয়াছে। তোমার বিরাগ ভাজন হইবার ভয়েই এতদিন কিছুই বলি নাই কিন্তু আজ বড় দুঃখেই তোমাকে সকল কথা বলিতেছি।" হোসেন সকল কথা বলিল।

নিশ্চল পুত্তলিকার মত নিঃশব্দে মনিয়া সকল কথা শুনিল। কিন্তু বিস্তর চেষ্টায়ও কিছুক্ষণ পর্য্যন্ত একটীও কথা বলিতে পারিল না। কতক্ষণ পরে সে বলিল "যা হবার তা হইয়াছে কিন্তু এখন আমাদিগকে এই পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কল্যই টাকা দিয়া তার জমিগুলি রক্ষা কর। অনুশোচনার মত আর প্রায়শ্চিত্ত নাই—সেই প্রায়শ্চিত্ত কর। আর যেখান হইতে হৌক তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার নিকট ক্ষমা ভিক্ষা কর। সে উন্নত চরিত্রের লোক, নিশ্চয় তোমাকে ক্ষমা করিবে। আর আমিও চিরদিন তুষানলে জ্বলিব—তাই আমার প্রায়শ্চিত্ত।"

পরদিন হোসেন বন্ধুর খোজে বাহির হইয়া গেল।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

দেহটী ঘোর কৃষ্ণবর্ণ। ইহারা কর্দ্দমের মধ্যে দেহটী প্রোথিত করিয়া বিশাল মুখগহ্বর ব্যাদন করিয়া থাকে এবং ঐ উজ্জ্বল পদার্থটী মুখের সম্মুখে ধরিয়া শিকারের প্রত্যাশায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। আলোতে প্রলুব্ধ হইয়া শিকার মুখের সম্মুখে আসিলে ভক্ষণ করে। এই জাতীয় মৎস্য সমুদ্রের তিন মাইল কিম্বা ততোধিক গভীর প্রদেশে পাওয়া যায়।

আর এক প্রকারের মৎস্য আছে, যাহাদের দন্তপাটির নির্ম্মাণ বড়ই আশ্চর্য্য জনক। উহাতে কব্জার মত বন্দোবস্ত আছে। উহারা মুখ ব্যাদন করিলে দন্তপাটি নরিয়া মাড়ির সঙ্গে যাইয়া লাগিয়া থাকে এবং মুখের ভিতরে তালুর নিকটে একটী স্থান উজ্জ্বল জোনাকির মত জ্বলিতে থাকে। ঐ আলোর প্রলোভনে কোন প্রাণী মুখমধ্যে প্রবেশ করিলে দন্তপাটি কব্জার মত ফিরিয়া আসিয়া উহার প্রত্যাবর্ত্তনের পথ বন্ধ করিয়া দেয়; এইরূপে ইহাদের আহার সংগ্রহ হইয়া থাকে।

সমুদ্রের মধ্যে নানারূপ উজ্জ্বল পোকা দৃষ্ট হইয়া থাকে। উহারা কেহবা সমুদ্রজলে চলাফেরা করে, কেহবা পাহাড়ের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্তে আশ্রয় গ্রহণ করে, কেহবা অপর কোন মৃতের কঙ্কালের ভিতরে অবস্থান করে। ইহাদের এক জাতীয় পোকা লম্বায় প্রায় ১৫ ফিট, প্রস্থ ২ আঙ্গুল এবং ১ আঙ্গুল স্থূল হইয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত ভগ্নপ্রবণ এবং সামান্য আঘাত মাত্রে খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। তখন ইহাদের এক একটী খণ্ডে এক একটী নূতন পোকার সৃষ্টি হইয়া থাকে।

জালের প্রতি উত্তোলনে সমুদ্রের গভীরতম প্রদেশ হইতে অনেক আশ্চর্য্যজনক প্রাণী উত্থিত হইয়া থাকে। একরূপ সর্প জাতীয় মৎস্য আছে দেখিতে অত্যন্ত কদাকার অধিকন্তু উহাদের দন্ত দুইটী বরাহ দন্তের মত বাহির হইয়া থাকে। ইহা যে কিরূপ বীভৎস দৃশ্য তাহা কল্পনাকরা সহজ।

পেলিকান নামে একরূপ মৎস্য আছে। তাহারা তাহাদের দেহ হইতে অনেক বৃহৎ মৎস্য ধরিয়া আহার করে। ইহা বস্তুতঃই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার। বোধ হয় ক্রমে ক্রমে হজম করে বলিয়াই এইরূপ আহার করা সম্ভব হয়।

কখন কখন একরূপ মৃত ফিতা মৎস্য পাওয়া যায়। উহারা লম্বায় ২০ ফিট, চওড়া ১ ফুট এবং ১ ইঞ্চি মাত্র স্থূল।

সময়ে সময়ে জলে এক প্রকার লাল জেলি মৎস্য পাওয়া যায়। উহাদিগকে স্পর্শ করা মাত্র উহারা একরূপ বিষাক্ত স্রাব নিক্ষেপ করে।

নদী কিম্বা পুকুরে আমরা যেরূপ অনায়াসে জাল হইতে কর্দ্দম, লতা, গুল্ম ইত্যাদি বিচ্ছিন্ন করিয়া মৎস্য সংগ্রহ করিয়া থাকি সমুদ্রে ইহা তত সহজ নহে। হয়ত জলে একরূপ ক্ষুদ্র লাল চিংড়ি কিম্বা কাল বাইম জাতীয় মৎস্য ও কিছু গুল্ম উঠিয়াছে—ইহা ধরিলেও বিপদ হইতে পারে। কারণ ইহাদের গাত্রে যে শেওলা আছে তাহাতে হয় ত একরূপ বিষাক্ত জেলী মৎস্যের নিসৃত স্রাব তখনও লাগিয়া রহিয়াছে। এই জাতীয় বিষাক্ত জেলী মৎস্যের স্রাবে বহু সুদক্ষ সন্তরণকারীর জীবনান্ত হইয়াছে। এই জেলী মৎস্যকে পর্ত্তুগীজ যুদ্ধ জাহাজ বলে। ইহাদের ৫। ৬ হস্ত লম্বা বাহু কিম্বা দলে মানুষের অঙ্গ স্পর্শ করিলে শরীর অবশ ও অসার হইয়া পরে।

সমুদ্রে প্রায় ৩ ইঞ্চি বড় একরূপ কাঁকড়া জাতীয় বিষাক্ত জন্তু আছে। ইহাদিগকে সহজে চক্ষে দেখা যায় না কারণ ইহারা স্বচ্ছ। যে চিনামাটির কলাইকরা পাত্রে জালে উত্তোলিত মৎস্যাদি রাখিয়া পরীক্ষা করা হয়, তাহাতে এই অদৃশ্য মৎস্যের অস্তিত্ব স্থির করা ভার। কেবল ইহাদের সংলগ্ন অপর মৎস্যের যন্ত্রণা ব্যঞ্জক আলোড়নে ইহাদের অস্তিত্ব অনুমান করিয়া নিতে হয়। চিমটা দ্বারা ধরিয়া উপরে উঠাইলে ইহাদিগকে কাঁচ নির্ম্মিত কাঁকড়া বলিয়া মনে হইবে। মারিয়া ফেলিলে ইহাদের রং সাদা হইয়া যায়। এলব্রেটম্ জাহাজ জাপান সমুদ্রে এই জাতীয় মৎস্য যথেষ্ট পাইয়াছিল।

ডাক্তার ক্লার্ক বলিয়াছেন যে, কোন কোন মৎস্য যে স্থানে বাস করে প্রয়োজন হইলে শরীরের রং সেই স্থানের অনুরূপ পরিবর্ত্তন করিতে পারে এবং এই উপায়ের দ্বারা আত্মরক্ষা করিয়া থাকে। কোন কোন মৎস্য দেখিতে বিচিত্র রামধনুর মত; দেখিলে সহজেই অপর মৎস্যের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় অথচ তাহারা নির্ভয়ে চলাফেরা করে। কারণ

নির্য্যাতিত কুলীরা যাহাতে পলায়ন করিয়া অত্যাচারীর কবল হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে, তিনি তাহারও উপায় করিয়া দিতে লাগিলেন। ঐ প্রদেশে একটী কয়লার খনি ছিল। সেখানেও সাহেব, বাঙ্গালী ডাক্তার ও অন্যান্য কর্ম্মচারিগণের অত্যাচারে খনির কুলীরা নিষ্পেষিত হইত। বিদ্যারত্ন মহাশয় ঐ দুই সংবাদপত্রে তাহাদের অত্যাচারের কথাও লিখিতে লাগিলেন। তখন সদাশয় লর্ড রিপণ ভারতের বড়লাট। ক্রমে এই সকল ব্যাপার লর্ড রিপণের কর্ণগোচর হওয়ায় তিনি আসামের চিফ কমিশনার সাহেবকে উহার সত্যাসত্য নিরূপণ করিতে হুকুম দিলেন এবং অসত্য হইলে সংবাদপত্রের রিপোর্টারকে শাস্তি প্রদান করিবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ করিলেন। ঐ সময় চা বাগানের সাহেবরা তাঁহার উপর খড়্গহস্ত,—সর্ব্বদাই তাঁহাকে জব্দ ও নির্য্যাতন করিবার সুযোগ খুঁজিতেছিল,—এমন কি তাঁহার প্রাণনাশের আশঙ্কাও ছিল। তজ্জন্য তাঁহাকে সাবধানে থাকিতে হইত। তদুপরি ঐ সরকারী হুকুম আসায় তাদের জুয়াচুরী হিসাবের কাগজপত্রও তাঁহাকে কোন ও উপায়ে সংগ্রহ করিয়া কমিশনার সাহেবকে দিতে হয়। প্রচুর ক্ষমতাশালী সাহেবদিগের সহিত একজন দরিদ্র নিঃসহায় বাঙ্গালী ধর্ম্মপ্রচারকের এই যুদ্ধ কিরূপ দায়িত্বপূর্ণ ও আশঙ্কাজনক হইয়াছিল তাহা সহজেই অনুমেয়। যাহা হউক কমিশনর সাহেবের অনুসন্ধানে সব সত্য বলিয়া সপ্রমাণ হওয়ায় দুষ্ট কর্ম্মচারিগণ কাজ হইতে বিতাড়িত হইল এবং কুলীদিগের প্রতি অত্যাচার কমিয়া গেল।

এক সময়ে একটী অত্যাচার পীড়িত পঞ্জাবী পরিবারকে পলাইয়া প্রাণ বাঁচাইবার জন্য নৌকা করিয়া সন্ধ্যাবেলা তাহাদিগকে রওয়ানা করিয়া দিলেন, এবং নিজে দ্রুতবেগে গৌহাটীর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পথিমধ্যে নদীতে বান দেখিয়া নৌকা না থাকায় সাঁতার দিয়া অনেক কষ্টে অপরপারে এক বনের মধ্যে উঠিলেন। পথ না জানায় ডাক-রাণারদের সঙ্গে দৌড়িয়া গৌহাটী পৌছেন। পথে তিনজন ডাক রাণার বদলি হয়। কিন্তু তিনি একাকী তিন জনের সহিত সমানভাবে দৌড়িয়া গৌহাটী পৌছেন, এবং সেই দিনই তথায় এক সভায় বক্তৃতা করেন।

কুলীদিগের দুঃখকাহিনী বিবৃত করিয়া তিনি "কুলী-কাহিনী" নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থ কুলী জীবনের একটী সজীব চিত্র। এই হিসাবে, এবং ইহা দ্বারা সমাজের যে কল্যাণ সাধিত হয় তাহা বিবেচনা করিলে ইহাকে বাঙ্গালার "Uncle Tom's Cabin" বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা Howard Wilber Forceএর কথায় মুগ্ধ হইয়া যাই, কিন্তু আমাদের একজন স্বজাতীয় মহাত্মা কুলীদিগের জন্য, আত্মত্যাগের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন, তাহা কি আমরা ভুলিয়া যাইব?

বীরভূম দুর্ভিক্ষের সময় ব্রাহ্মসমাজ বিদ্যারত্ন মহাশয়কে আদেশ করেন যে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য তাঁহাকে উত্তর বঙ্গে যাইতে হইবে। ঐ দিন সন্ধ্যায় Wellington Squareএ বসিয়াছিলেন, এমন সময় তাঁহার কাণে গেল কে যেন বলিয়া গেল,—"তোমার ঘরের কাছে এত অন্নকষ্ট ও হাহাকার,—ইহার কোনরূপ প্রতিকারের চেষ্টা না করিয়া তুমি কোথায় যাও?" তিনি সেই দিনই ব্রাহ্মসমাজ কমিটীর নিকট আবেদন করিলেন,—"আমাকে এই দুর্ভিক্ষ নিবারণের কার্য্যে নিযুক্ত করুন, এবং কমিটীর যদি সেরূপ অভিপ্রায় না হয়, তাহা হইলে আমাকে ছয় মাসের ছুটী দেওয়া হউক।" কমিটী মন্তব্য করিলেন যে আধ্যাত্মিক অভাব হইতে দৈহিক অভাবের দিকে ইঁহার দৃষ্টি বেশী। এবং তাঁহাকে দুর্ভিক্ষের কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া বিনা বেতনে ছয় মাসের ছুটী দিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় স্বর্গীয় শিবচন্দ্র দেবের পত্নীর নিকট দুর্ভিক্ষ চাঁদা ১০৲ টাকা মাত্র সাহায্য পাইয়া বীরভূম যাত্রা করিলেন। এদিকে তাঁহার স্ত্রী সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিবার জন্য সৈদপুর বালিকা বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য লইয়া সেই সামান্য আয়ে সংসার চালাইতে লাগিলেন। বিদ্যারত্ন মহাশয় সমস্ত দিন দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের যথাসাধ্য সাহায্য করিতেন, এবং সন্ধ্যার ট্রেণে আজিমগঞ্জ গিয়া সকলের নিকট ভিক্ষা করিয়া প্রাতে ফিরিয়া আসিতেন। পরে বুধসিংহ নামক এক ধনী মহাজনের সাহায্যে দুইশত লোক খাইতে পারে এমন একটী অন্নসত্র খুলিলেন এবং ধনপৎ লক্ষ্মীপৎ সিংহ রাও আর একটী ঐরূপ অন্নসত্র করিয়া দিলেন। ক্রমে বীরভূম জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট (Mr, W. Fedjam) সাহেবের কৃপাদৃষ্টি

করিতে শুনিয়াছি। তথায় তিনি পুনরায় উপবীত গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া বিধিমত সন্ন্যাস আশ্রমে দীক্ষিত হইলেন। বলা বাহুল্য এক সময়ে যে ব্রাহ্মসমাজের জন্য তিনি জীবনের রক্তপাত করিয়াছিলেন, নব সত্যের আলোকে আর তাহার সহিত সম্বন্ধ রাখিতে পারিলেন না। অতঃপর তিনি শ্রীমৎস্বামী রামানন্দ ভারতী নামে পরিচিত হইলেন।

সন্ন্যাস গ্রহণের পর স্বামীজী নানা তীর্থ পর্য্যটন করেন। তবে উত্তরাখণ্ড ও হিমালয়ের নিভৃত প্রদেশেই তিনি অধিক সময় যাপন করিতেন।

শেষ জীবনে তিনি হিমালয় অতিক্রম করিয়া তিব্বতের কৈলাস ও মানসসরোবর দর্শন করিয়া আসিয়াছিলেন। ইহার বিস্তৃত ও কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণ "সাহিত্য" পত্রিকার "হিমারণ্য" শীর্ষক ধারাবাহিক প্রবন্ধ-মালায় বিবৃত হইয়াছে। এক সময়ে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক "ভারতবর্ষ" মাসিক পত্রের বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুত জলধর সেন স্বামিজীর সহিত হিমালয়ের কতক স্থান ভ্রমণ করিয়াছিলেন। জলধর বাবু এই ভ্রমণবৃত্তান্ত তাঁহার হিমালয় নামক উপাদেয় গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। উহাতে স্বামিজীর মহান চরিত্রের কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যায়।

হিমালয় হইতে পুরী পর্য্যন্ত নানাস্থানে স্বামিজীর শিষ্য ও কৃপাপাত্র সকল বর্ত্তমান আছেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পূর্ব্বে ব্রাহ্ম বা অতিমাত্রায় ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন তাঁহাদেরও অনেকে আছেন, আবার টোলের উপাধিধারী নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও আছেন। আমরা দেখিয়াছি ৺কাশীধামের সন্ন্যাসী, সাধু, সাধক ও নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ তাঁহাকে গভীর শ্রদ্ধার চক্ষে নিরীক্ষণ করিতেন, এবং এরূপ বহুলোক তাঁহার উপদেশ গ্রহণ জন্য সর্ব্বদা তাঁহার নিকট আসিতেন। তিনি নিজের জীবনের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া হিন্দুসমাজকে পুনরায় সেই ঋষি প্রদর্শিত পথে লইয়া যাইতে চেষ্টা করিতেন। একদিকে পূজ্যপাদ গোস্বামী মহাশয়ের জীবন, অন্যদিকে স্বামিজীর জীবনের পরিবর্ত্তন ব্যাপারে হিন্দু ব্রাহ্ম উভয় সমাজের যেন চোখের ধাঁধাঁ ঘুচিতে লাগিল। টোলের একজন ক্রিয়ান্বিত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত পৈতা ছিঁড়িয়া ঘোরতর ব্রাহ্ম হইলেন, আবার কি বুঝিয়া শেষে হিন্দুমতে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দেব দেবীতে ভক্তি ও সমাজ রক্ষার বাণী প্রচার করিতেছেন! অবশ্যই হিন্দুধর্ম্মে সারবান পদার্থ আছে—দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইবার পক্ষে ইঁহার জীবন কম কার্য্যকরী হয় নাই।

পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থ ছাড়া তিনি 'চিরযাত্রী', 'অলর্কচরিত', 'যাজ্ঞবল্ক্য চরিত', 'চারু দত্তের গুপ্তধন আবিষ্কার', 'সাধনতত্ত্ব' প্রভৃতি গ্রন্থ ব্রাহ্ম থাকা কালীন রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু সব গ্রন্থই উদাসীন প্রণীত। তাঁহার এই সকল গভীর আধ্যাত্মিক ভাবমূলক গ্রন্থ পড়িয়া অনেকেই উপকৃত হইয়াছেন, কিন্তু এই উদাসীন কে? তাহা অল্প লোকেই জানেন। নিজের কথা বলা যদি মার্জ্জনীয় হয়, তবে বলিতে পারি আমিও এই উদাসীনকে চিনিতাম না, কিন্তু যখন আমি বালক মাত্র, তখন তাঁহার 'চিরযাত্রী'-গ্রন্থখানি পড়িয়া উহাকে হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশে মহোপদেশকের স্থান দান করিয়াছিলাম। এই গ্রন্থখানি বাঙ্গালার Pilgrim's Progress, কিন্তু 'চিরযাত্রী'র চাল-চলন, বেশ-ভূষা, আশা আকাঙ্খা সমস্তই আমাদের স্বজাতীয়, সুতরাং তাহার সহিত চলিতে কোন ভয় নাই।

সন্ন্যাস জীবনেও তিনি পূর্ব্বোক্ত 'হিমারণ্য' ব্যতীত 'শঙ্কর চরিত' ও ব্রাহ্মাবস্থায় লিখিত 'কবিরে'র পরি-শোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ লিখিয়া গিয়াছেন। দুর্ভাগ্য বশতঃ অদ্যাপি ঐ সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নাই।

১৩০৮ সালের পৌষ মাসে তিনি ৺কাশীধামে দেহ রক্ষা করেন, এবং তাঁহার দেহ সাধুভক্তগণ দ্বারা পূজিত হইয়া কীর্ত্তন সমারোহের সহিত মণিকর্ণিকার গঙ্গায় সমাহিত হয়।

তদানীন্তন 'বসুমতী' পত্রের সম্পাদক পূর্ব্বোক্ত জলধর সেন মহাশয় স্বামিজীর দেহাত্যয়ের সংবাদে লিখিয়াছিলেন—

"প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক রামানন্দ ভারতী মহাশয় গত ১লা পৌষ বারাণসীক্ষেত্রে দেহত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিয়াছেন। ভারতী মহাশয়ের শেষ জীবন তীর্থ পর্য্যটন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। যৌবনকালে ইনি ব্রাহ্ম প্রচারব্রত লইয়া দেশে দেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন। আসামের কুলিদিগের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য এক সময়ে ইনি অদ্ভুত পরিশ্রম করিয়াছিলেন। শেষ জীবনে সুদূর হিমালয়ের গিরি গুহায় বসিয়া এক এক

কেনেডার একজন কীট তত্ত্ববিদ পণ্ডিত গোল আলুর এক জাতীয় কীট সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে—যদি গোল আলুর এক জোড়া কীটকে নির্বিবাদে বর্দ্ধিত হইতে দেওয়া হয়, তাহা হইলে এক ঋতুতে উহাদের সংখ্যা কোটিতে পরিণত হইবে। এবং এই হারে এই কীট-কুলকে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে দিলে, আলু পৃথিবী হইতে লোপ পাইতে অধিক সময় লাগিবে না।

যাহারা সূর্য্যমণ্ডল অন্ধকার করিয়া পঙ্গপাল চলিতে দেখিয়াছেন, তাহারা বুঝিতে পারিবেন যে যদি ইহাদের আণ্ডা, বাচ্চা ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে পায়, তাহা হইলে পৃথিবীর কি ঘোর অনিষ্ট সাধিত হয়।

কীটের বংশ বৃদ্ধি যেরূপ প্রচুর, উহাদের আহারও তদনুরূপ প্রচুর। পতঙ্গ জাতীয় কীট দৈনিক তাহার ওজনের দ্বিগুণ পাতা আহার করিয়া থাকে। একটি ঘোটককে ঐ অনুপাতে খোরাক যোগাইতে হইলে সে দৈনিক প্রায় ২৮ মণ ঘাস ভক্ষণ করিত। পণ্ডিত ফরবুস বলেন যে মাংস ভোজী এরূপ কীটাণু আছে যে দৈনিক তাহাদের শারীরিক ওজনের ২০০ শত গুণ আহার করিয়া থাকে। মানব জগতে এরূপ হইলে আমাদের একটি সদ্যজাত শিশু জন্মিবার দিন হয় ত ১৮।১৯ মণ মাংস ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। এবং এইরূপ আহার করিয়াই জীবন ধারণ করিতে হইত।

এখন দেখা যাক কে এই ক্ষুদ্র রাক্ষস দলকে দমিত করিয়া সমস্ত পৃথিবীর আহার্য্য রক্ষা করিয়া থাকে? মানব ইহাদের হাত হইতে আহার্য্য রক্ষা করিতে অপারগ। মানুষ হয় ত তাহাদের বহু ব্যয়-সাধ্য রাসায়নিক প্রস্তুত বিষ আদি দ্বারা কোনরূপে তাহার ফুল কিংবা ফলের বাগানটি রক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে পারে, কিন্তু তাহাতেও যথেষ্ট বিপদের সম্ভাবনা। বিস্তৃত কৃষিক্ষেত্রে কিম্বা বন প্রদেশে এই সকল কীটের ক্রিয়া আংশিক দেখিবা মাত্র মানব ভয়ে উর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিবে। তবে জিজ্ঞাস্য, এস্থলে রক্ষা কর্ত্তা কে? আমি বলিব পাখী। সে জন্যই বোধ হয় ভগবান কীট পতঙ্গকে পাখীর প্রধান আহার করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু মানব অন্ধের মত গত অর্দ্ধ শতাব্দী হইতে প্রকৃতির এই হিতকারী পক্ষী বধ করিতে যেন বদ্ধ পরিকর হইয়াছে। মানুষ বর্ত্তমান কিম্বা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বিশেষ কোন চিন্তা না করিয়াই এইরূপ ধ্বংস সাধন কার্য্যে রত, যাহা প্রকৃতি হয় ত শত শত বৎসরেও করিত না। সৃষ্ট জীবের মধ্যে কাহাকে রাখিতে হইবে, কাহাকে মারিতে হইবে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কর্ত্তা মানব নহে।

জীবগণ সকলেই নিজ নিজ বংশ বৃদ্ধি করিতে প্রস্তুত। আবার তাহার সমতা রক্ষা করিতে তাহার পার্শ্বেই অপর জীব বর্ত্তমান। প্রকৃতির এই সমতা রক্ষার কোন ব্যতিক্রম ঘটাইলে বিষম অনর্থ সঙ্ঘটন হওয়া সম্ভব। মানুষ কীট ভক্ষণকারী পাখী মারিয়া পৃথিবীতে কতবার যে শস্য বনাশ-কারী কীটের প্রাদুর্ভাব ঘটাইয়া ফসল জন্মিবার বিষম অনর্থ সংঘটন করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

আমি একবার সরকারী কৃষি বিভাগের প্রচারিত ইন্দুর মারিবার একটী সহজ উপায় দেখিয়া বড়ই পুলকিত হইয়াছিলাম। কারণ সে সময়ে আমার গৃহাদি গর্ত্তের ইন্দুরে পরিপূর্ণ ছিল। অদৃশ্য অপকারের ত কথাই নাই এমন কি আমাকে ইন্দুরের সহিত প্রকাশ্য লড়াই করিয়াই আহারাদি করিতে হইত। একটু উন্মনস্ক হইলেই পাতের মৎস্যটুকু পর্য্যন্ত অন্তর্হিত হইত। সেই সময়ে রিপোর্টে দেখিলাম—কার্ব্বন বাইসালফাইড (Carbon Bisulphide) গর্ত্তে দিয়া একটু অগ্নি সংযোগ করিলেই গর্ত্তের ইন্দুর শেষ হইবে। আমি তৎক্ষণাৎ Carbon Bisulphide আনাইয়া কার্য্য আরম্ভ করিলাম। তাহাতে আমাদের গৃহের ইন্দুর মরাত দূরের কথা ইন্দুরের উপদ্রব যেন দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। কিছুদিন পরে একটি বিড়াল শাবকের আবির্ভাবে ইন্দুরের সর্ব্ববিধ উৎপাত একেবারে বন্ধ হইয়া গেল। যে কার্য্য আমি টাকা ব্যয় করিয়া করিতে পারি নাই, তাহা এখন বিনা ব্যয়ে সম্পন্ন হইল। ঢাকা বিক্রমপুর এবং ময়মনসিংহের কোন কোন স্থানে কচুরি নামক জলজ গুল্মের প্রভাবে কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্থ হইতেছে। কিছুদিন হয় ঢাকার গভর্ণমেণ্ট কৃষিবিভাগ এই গুল্ম হইতে কোনরূপ সার বাহির করিয়া গুল্ম দমনের উপায় উদ্ভাবনে চেষ্টিত ছিলেন। হয়ত বহুব্যয়ে এই গুল্ম হইতে সার প্রস্তুত হইবে কিন্তু তাহাতে এই কচুরির বংশ বৃদ্ধি বন্ধ হইবে কিনা সন্দেহ। আমাদের মনে হয় কচুরি গুল্ম

ব্যথিতের বেদনায়ক্লিষ্ট করুণামাখা স্বর শুনিয়া বৃদ্ধার হৃদয় খুলিয়া গেল। সে চীৎকার করিয়া বলিল "আমার এ সংসারে কেউ নাই মা ; আমার কেউ নাই।"

রমণী তেমনি স্বরে বলিল—"যার কেউ নাই তার যে তিনিই আছেন মা"।

সেই বৃদ্ধা তাড়াতাড়ি বলিলেন—"তিনি কি আছেন মা ; তবে আজও কি দুঃখিনীর শাস্তি শেষ হইত না।"

খুব করুণ স্বরে রমণী বলিলেন—"মা এমন কথা কেন বলিতেছ ? তোমার এমন কি কষ্ট ; আমায় বলিতে কোন দোষ নাই মা ! যদি কোন কিছু করিতে পারি।"

"তুমি আমার কি করিবে মা, বহু দূরদেশ হইতে, পরম দেবতা বিশ্বনাথ ও মা অন্নপূর্ণার শ্রীপাদ দর্শন করিয়া জীবনের অবশিষ্ট কাল কাটাইয়া যাইব ভরসাতেই গৃহ হইতে বাহির হইয়াছিলাম। শুনিয়াছিলাম কাশীতে অনেক ছত্র আছে, তাহাতে কায়ক্লেশে চলিয়া যায় ; এখন দেখিলাম, সে আমার ভাগ্যে নাই ; বিশ্বেশ্বর দর্শনই আমার ভাগ্যে ঘটিয়া উঠিল না—অনাহারে মৃত্যুই আমার অদৃষ্টে লেখা আছে। অন্নপূর্ণা দয়া করিয়া যাহার জন্য দুটী অন্ন রাখেন নাই, বিশ্বেশ্বর যাহাকে দর্শন দিতে কুণ্ঠিত, মানুষ তাহার কি করিতে পারে মা !"

প্রৌঢ়া সন্ত্রস্থ ভাবে বলিলেন —"এ কথা কেন মা।"

নিজ উদর দেখাইয়া বৃদ্ধা বলিল "আজ তিনদিন এ উদরে কিছুই স্থান পায় নাই মা। হতভাগিনী আমি—"

"কেন ? কোন্ ছত্রে তু'ম যাও নাই মা ? সেগুলি যে কেবল দীন দরিদ্রের জন্যই খোলা আছে। অন্নপূর্ণার দ্বারে আসিয়া আজ মা তুমি অন্নের জন্য হাহাকার করিবে, একি সম্ভব ?"

"ছত্রে কি মা আমাদের ন্যায় দীন দুঃখীর স্থান আছে ? আমি দুদিন সেখানে গিয়াছি কিন্তু কেউ মুখ তুলিয়া চায় না। পশ্চিমা দারোয়ানগুলা ছত্রে ঢুকিতে দেয় না। কিছু না দিলে কি মা বড় লোকের বাড়ীর চাকর পথ ছাড়ে। আমি পয়সা কোথা পাব মা।"

"আচ্ছা আমি তোমায় আজ এক ছত্রে ভর্ত্তি করিয়া দিতে চেষ্টা করিব ; সে জন্য তোমাকে আর ভাবতে হবে না। তুমি এইখানে অপেক্ষা কর আমরা স্নান করিয়া আসি।"

স্নান আহ্নিক শেষ করিয়া আসিয়া প্রৌঢ়া হাত ধরিয়া বৃদ্ধাকে লইয়া চলিলেন। কতদূর যাইয়া বৃদ্ধা বলিলেন "মা এই বাড়ীতে আমি থাকি।"

প্রৌঢ়া বলিলেন "তবে মা তুমি তোমার ঘরে যাও, আমি তোমার কি করিতে পারি তাহার জন্য এখনই চেষ্টা করিতেছি। আশাকরি বিশ্বেশ্বরও অন্নপূর্ণার কাশীতে তোমাকে আর উপবাস থাকিতে হইবে না।" প্রৌঢ়া সঙ্গিনীগণের সহিত চলিয়া গেল।

বৃদ্ধা গৃহে আসিয়া ভাবিতে লাগিল এ রমণীর হৃদয়ে কত দয়া—কিন্তু সে আমার জন্য কি করিতে পারিবে ? অন্নপূর্ণার ভাণ্ডারে যার অন্ন নাই, মানুষ তাহার কি করিতে পারে ?

কিছুক্ষণ পরেই এক বিশালকায় পাঁড়ে ঠাকুর এক ভার-বাহকের স্কন্ধে ভার বোঝাই করিয়া চাউল, দাইল, তরি তরকারী, প্রভৃতিতে এক বিধবার সপ্তাহের আহার্য্য লইয়া আসিয়া সেই জীর্ণ বাড়ীর সম্মুখে ডাক হাঁক করিতে লাগিল। বৃদ্ধা দরজা খুলিলে সে সেইগুলি তাহার জন্য রাখিয়া চলিয়া গেল। অযাচিত অপরিমিত দান সামগ্রী সম্মুখে দেখিয়া বৃদ্ধার দুই চক্ষু কৃতজ্ঞতার অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। সে বিশ্বেশ্বরের পরম মহিমা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিয়া ভাবিল, এতদিনে সত্যসত্যই বুঝি মা অন্নপূর্ণা মুখ তুলিয়া চাহিলেন।

(২)

কাশীর বিশ্বেশ্বরের আরতি এক দর্শনীয় বস্তু। এমন হিন্দু নাই যে কাশীতে আসিয়া বিশ্বেশ্বরের আরতি দর্শনের লোভন ত্যাগ করিতে পারে। হিন্দুর চির আকাঙ্খিত বস্তু——বিশ্বেশ্বরের আরতি। এই আরতির সময় বিশ্বনাথের প্রাঙ্গন, নাটমন্দির, সর্ব্বত্র লোকে লোকারণ্য হয়—তিল রাখিবার স্থান থাকে না। অযুত কণ্ঠের সমস্বরে সমতানে উচ্চারিত 'শিব শিব শম্ভো' রবে বিশাল পুরী মুখরিত হয়। বালক, বালিকা যুবকযুবতী প্রৌঢ় প্রৌঢ়া বৃদ্ধ বৃদ্ধা নানা বয়সের নানা প্রকারের অসংখ্য নরনারী তাহাদের হৃদয়ের দুঃখ শোক, ব্যথা বেদনা, আদিব্যাধি সেই পাষাণ দেবতার চরণ তলে নিবেদন করিয়া, ফল কামনায় নানারূপ মানত করিবার সুবর্ণ সুযোগ প্রাপ্ত হয়। তখন অসংখ্য লোক মন্দিরে প্রবেশ করিবার জন্য প্রাণপাত চেষ্টা করে।

অন্নর করুন, মা অন্নপূর্ণা তাঁহার ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া রাখুন—"বলিতে বলিতে বৃদ্ধা কাঁদিয়া ফেলিল।

বৃদ্ধা গৃহে আসিয়া শুনিল—কাল রাজ বাটীতে অন্যান্য ব্রাহ্মণ মহিলা ও কুমারীগণের সহিত তাহারও ভোজনের নিমন্ত্রণ হইয়াছে। সে অন্নপূর্ণা-বিশ্বেশ্বর দর্শনের ন্যায় দীনের আশ্রয় রাণী বিদ্যাময়ীকে দর্শন করিবার জন্য লালায়িত হইয়া রহিল।

(৩)

রাণী বিদ্যাময়ীর গৃহে মহোৎসব। আজ রাণী বিশ্বেশ্বরের চরণে সাপ্তাহিক অর্ঘ্য প্রদান করিবেন। দ্বিপ্রহরে রাজবাটীতে বিরাট ভোজের আয়োজন হইয়াছে। চারিদিকে আন—দাও—খাও—ব্যতীত আর অন্য কথা নাই। অন্ন, বস্ত্র ও অর্থের যেন লুট পড়িয়াছে।

বৃদ্ধা যে দিকে যাইতেছে, সেই দিকেই লোকের কোলাহল। বাহিরে ব্রাহ্মণ ভোজন, ভিতরে কুমারী ভোজন,—সধবা ভোজন, বিধবা ভোজন। কেহ খাইতেছে, কেহ খাওয়াইতেছে—কার্য্যের বিরাম নাই। একদিকে অন্ধ আতুর অর্থ ও বস্ত্র লইতেছে, অন্য দিকে দীন দরিদ্র ভিখারীর দল ইচ্ছানুরূপ খাইতেছে ও খাদ্যদ্রব্য বাঁধিয়া লইতেছে। এই অজস্র দান ও গ্রহণের দৃশ্য দেখিয়া দেখিয়া বৃদ্ধার প্রাণ ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় গলিয়া গেল। বৃদ্ধা তখন তাঁহার সেই হিতৈষিণী প্রৌঢ়া রমণীকে ও তাঁহার মুনিব, দীনের আশ্রয় রাণী বিদ্যাময়ীকে দেখিবার জন্য এবং তাঁহার নিকট প্রাণের ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার জন্য আকুল ভাবে তাঁহাদিগকে খুজিয়া বেড়াইতে লাগিল।

নানাদিক ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে অকস্মাৎ সে এক স্থানে দেখিল তাহার সেই পরম হিতৈষিনী প্রৌঢ়া রমণীটী এক স্থানে দাঁড়াইয়া দরিদ্র স্ত্রীলোক ও বালক বালিকা দিগকে দান করিতেছেন।

বৃদ্ধার দিকে তাহার দৃষ্টি পতিত হইবা মাত্র প্রৌঢ়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন: "মা তোমার আহার হইয়াছে কি?

বৃদ্ধার চক্ষু হইতে কৃতজ্ঞতার ধারা দরদর ধারে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে প্রৌঢ়ার হাত দুখানা ধরিয়া বলিল—"মা আর জন্মে তুমিই আমার মা ছিলে মা,—মার কাজ করিলে, অন্ন বস্ত্র দিয়া পালন করিলে। এখন মা, এ দীনের আশ্রয় সেই রাণীমাকে একবার দর্শন করাইয়া দাও তাঁহাকে না দেখিলে আমার আহার হইবে না।"

প্রৌঢ়া তাহাকে আহারের জন্য লইয়া চলিলেন এবং যাইতে যাইতে বলিলেন—'তুমি আহারাদি শেষ করিয়া এই স্থানে অপেক্ষা করিও। ততক্ষণে রাণীমারও স্নান পূজা শেষ হইবে। তখন তাঁহার সহিত সুবিধা মত সাক্ষাৎ হইবে। আমিই তাহার বন্দোবস্ত করিয়া দিব।'

বৃদ্ধা আহারে বসিলে, প্রৌঢ়া পরিবেশনকারীদিগকে এটা দাও—সেটা দাও বলিয়া বৃদ্ধাকে তৃপ্তির সহিত আহার করাইলেন। বৃদ্ধা জীবনে এত আত্মীয়তা তাহার পরমাত্মীয়গণের নিকটও কখন প্রাপ্ত হয় নাই।

* * * *

সন্ধ্যার প্রাক্কালে একজন ঝি আসিয়া বলিল "রাণী মা এখন অর্ঘ্য লইয়া যাইবেন, আপনাকে তাঁহার নিকট যাইতে বলিয়াছেন।"

বৃদ্ধার হৃদয় আনন্দে ভরিয়া গেল। সে আনন্দ যেন তাহার হৃদয়ে ধরিতেছিল না। চলিতে চলিতে দুইবার পড়িয়া যাইতেছিল। ঝি তাহাকে ধরিয়া লইল।

প্রশস্ত কক্ষ আলোক-মালায় উদ্ভাসিত, তাহারই এক পার্শ্বে একখানা গালিচার আসনে নামাবলী গায়ে উপবিষ্টা দীনের আশ্রয়—রাণী বিদ্যাময়ী—হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। সমস্ত দিনের শ্রান্তির পর এখন—ব্যাপার সুনির্ব্বাহ করিয়া—রাণী মালা জপ করিতেছিলেন। কি সুন্দর সে রূপ—নাকে মুখে যেন একটা প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের ছায়া খেলা করিতে ছিল। পুণ্যের বিমলপ্রভায় সে আলোকদীপ্ত কক্ষকে যেন আরও উজ্জল করিয়া তুলিয়াছে।

বৃদ্ধা দুর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া ভক্তিতে অবনত হইয়া পড়িল। তার পর ঝি যখন তাহাকে রাণীর সম্মুখে আনিয়া বসাইল তখন বৃদ্ধা রাণীর মুখের দিকে চাহিয়া ভাবে ভক্তিতে বিহ্বল হইয়া দুই চক্ষু হইতে অজস্র অশ্রুধারা ত্যাগ করিতে লাগিল। বৃদ্ধা দেখিল—রাণী বিদ্যাময়ীই তাহার সেই মণিকর্ণিকা ঘাটের প্রৌঢ়া হিতৈষিণী। "মা তুমিই কি দীনের আশ্রয়—রাণী বিদ্যাময়ী"—বলিয়া বৃদ্ধা তাঁহার চরণ তলে লুটাইয়া পড়িল। রাণী তাঁহাকে দুই হাতে তুলিয়া লইলেন।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মজুমদার।

হিংসানল নির্ব্বাপিত হইবে কি ? না। সেই দুর্ব্বৃত্ত যাহাকে দুগ্ধ দিয়া এতকাল কালসর্পবৎ পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম, পুষ্পমালা জ্ঞানে এতকাল যে বিষধরকে, কণ্ঠহাররূপে স্থান দিয়া আসিতেছিলাম, ইহ সংসারে সে জীবিত থাকিতে আমার এ কলঙ্ক দূর হইবে না। যে অস্পৃশ্য ভূলুণ্ঠিত অনাদৃত পারিজাতকে আমি দেব পূজায় উৎসর্গ করিব মনে করিয়াছিলাম ; আজ সেই পুষ্পাবরণে লুক্কায়িত কালভুজঙ্গ আমাকে দংশন করিল! মহাপ্রলয়ে পৃথিবীর শেষ চিহ্ন পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইলেও আমার এ কলঙ্ক দূর হইবে না। আগে কঙ্ককে ভস্ম করিব, তারপর দুঃহতারূপিনী কালভুজঙ্গিনীকে অনলে পুড়াইয়া নিজেও অনলে প্রবেশ করিব। ঐ শুনা যায় দুষ্টগণের অট্টহাসি টিট্‌কারী দাঁড়াও কঙ্ক দাঁড়াও লীলা!

ক্ষিপ্ত গ্রহের মত গর্গ একবার নদীতটাভিমুখে, ছুটিয়া গেলেন, পরক্ষণেই আবার ফিরিয়া আসিলেন। কুটীর প্রান্তে আসিয়া ডাকিলেন—লীলা!

লীলা এ সর্ব্বনাশের কথা কিছুই জানিতে পারে নাই। পিতার আহ্বানে অন্যান্যদিনের মত, তেমনি সস্মিতমুখে শালতরুপার্শ্বে, ক্ষুদ্রকায় বনলতাটীর মত আসিয়া দাঁড়াইল। হায়! হতভাগিনী জানিতে পারে নাই, যে সেই স্নেহবারিগর্ভমেঘ, আজ তাহার কপাল দোষে বজ্রাগ্নিতে পূর্ণ।

বুভুক্ষু শার্দ্দুল যেমন শিকার লক্ষ্য করিয়া তাকায়, মর্ম্মভেদী দৃষ্টিতে গর্গ তেমন করিয়া লীলার পদনখ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত একে একে লক্ষ্য করিতেছিলেন। লীলা নির্ব্বাক নিস্পন্দ, এ মর্ম্মভেদী দৃষ্টির কোন অর্থ বুঝিতে পারিল না।

কম্পিত কণ্ঠে গর্গ বলিলেন,

শুন কন্যা লীলাবতী আমার বচন।
ঝাটহ জলের ঘাটে করহ গমন॥
শীঘ্রগতি আন জল কলসী ভরিয়া।
দেবের মন্দির গেল অপবিত্র হইয়া॥
কুস্বপন দেখিয়াছি কালি নিশাভাগে।
দেবতা চলিয়া যান তেই সে বিরাগে॥

কাল রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছি, আমার পূজার মন্দির অপবিত্র হইয়াছে। তুমি জল লইয়া আইস, আমি নিজ হস্তে দেব মন্দির ধৌত করিব। তারপর জন্মের মতন একবার শেষ পূজায় বসিব! লীলা পিতার এই সকল কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিতেও সাহস পাইল না ; কেবল মনে মনে আপনাকেই প্রশ্ন করিতে লাগিল।

"দৈবেতে ঘটাইল কিবা অঘট ঘটন।
আজি কেন পিতা গর্গ হইলা এমন॥"

মনের ভিতর খুঁজিয়াও একথার কোনও উত্তর পাইল না। তখন তাড়াতাড়ি,—

"গাগরী তুলিয়া কাঁকে লীলা যায় জলে।
পথ নাহি দেখে লীলা নয়নের জলে॥

কৈ আমি ত ভ্রমে ও কোন দিন পিতার চরণে অপরাধ করি নাই, তবে--

"এমন হইলা পিতা কিসের কারণ
কোন দিন দেখি নাই বিরস বদন"

কত কি ভাবিতে ভাবিতে লীলা আপন ক্ষুদ্র কলসীটী কাঁকে করিয়া ঘাটের পথে চলিতেছিল। এমন সময় গর্গ আবার ডাকিলেন,

"শুন কন্যা লীলাবতী আমার বচন।
আমিই আনিব জল দেবের কারণ॥
কলসী রাখিয়া তুমি যাও নিজ ঘরে।
দেবের নৈবেদ্য মোর খাইল কুকুরে॥"

শ্রক্‌চন্দন-পূত কৃত যজ্ঞ বেদী আজ চণ্ডালের কর স্পর্শে কলঙ্কিত! আমি এ সংসারে আর কাহাকেও বিশ্বাস করিতে পারি না।লীলা তুমি ঘরে যাও, আমার দেব পূজার নৈবেদ্য কুকুরে গ্রাস করিল। চণ্ডাল কর স্পর্শে আমার পূজার ফুল অপবিত্র হইল। লীলা ফিরিয়া আসিল, গর্গ তখন উন্মত্তের মত প্রাঙ্গণ জুড়িয়া ছুটাছুটী করিতেছিলেন। ভয়ত্রস্তা বিস্মিতা লীলা কলসী রাখিয়া তাড়াতাড়ি গৃহে ছুটিয়া গেল।

গর্গ নদীতে গেলেন। নিজ হস্তে কলসী ভরিয়া জল আনিলেন। নিজ হস্তে দেবের মন্দির পবিত্র করিলেন। লীলার চয়িত পূজার ফুল বাহিরে নিক্ষেপ করিলেন। সিংহাসন, শালগ্রাম শিলা সমস্ত ধৌত করিলেন। করিয়া পূজায় বসিলেন। আজিকার পূজায় ফুল নাই, নৈবেদ্য

"অপরাধ করিয়াছি পিতার চরণে।
স্বপনেও হেন কথা নাহি পড়ে মনে॥"

ইহার পর আমরা মরিলে, পিতা যখন প্রকৃতিস্থ হইয়া শাবক হারা বিহঙ্গের মত আমাদের অন্বেষণ করিবেন তখন যেখানেই থাকি স্থির থাকিতে পারিব না।

"অপরাধ যোগ্য কার্য্য কিছুই না জানি।
সাক্ষী আছে চন্দ্র সূর্য্য দিবস রজনী॥
মনে করি বনে করি যত অনাচার।
দেবতা ধরম দেখ সাক্ষী হয়রে তার॥

ধর্ম্ম আছেন, জগতে চন্দ্রসূর্য্য আছে, তাহারা সাক্ষী। প্রবল ঝঞ্ঝাবাতে আজ মহাগিরি বিচলিত। এ'র পরই দেখিব দিব্য জ্যোতি সম্পন্ন মহাপুরুষের জ্ঞানালোক, আমাদের অন্ধকার পথের সন্ধান বলিয়া দিতেছে, আমি চলিলাম।

"মেলানি মাগিছে কঙ্ক লীলা তোমার কাছে।
আবার হইবে দেখা প্রাণে যদি বাঁচে।
কিছু কাল ঘরে লীলা তুমি রহ একাকিনী,
সুরভি পাটলী তোমার রহিল সঙ্গিনী।
ঘরে আছে পোষারে পাখী হীরা মন পাখী
তাহারে ডাকিও রে লীলা কঙ্ক নাম ধরি।
নাহি মাতা নাহি রে পিতা আমার নাহি বন্ধু ভাই
যে দিকে কপালে নেয় তথি চইলে যাই।
আর এক কহিব লীলা গো আমার নিবেদন,
অভাগা বলিয়া কঙ্কে রাখিও স্মরণ।"

কঙ্ক যখন লীলার নিকট হইতে, এইরূপ কিছু কালের জন্য, কিম্বা নিয়তির কুট চক্রান্তে ইহ জীবনের জন্য শেষ বিদায় প্রার্থনা করিতেছিলেন। তখন গর্গ, কঙ্কের প্রাণ বিনাশের পথ পরিস্কার করিয়া, কিরূপে সেই বিশ্বাসঘাতিনী কন্যার প্রাণ বিনষ্ট করিবেন, তাহার উপায় স্থির করণার্থ রাজ রাজেশ্বরীর তটে, উন্মত্তের ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ছিলেন। তাহার ক্ষুধা তৃষ্ণা জ্ঞান নাই। দেব পূজায় মন নাই, বিগত সারা রজনী বিনিদ্র নয়নে কেবলই সেই অবিশ্বাসিনী কন্যার প্রাণ নাশের জন্য, নিজ মনোবৃত্তি গুলির সঙ্গে, দ্বন্দ্ব যুদ্ধে কাটাইয়াছেন। একবার ভাবিয়াছেন আগুণে পুড়াইয়া মারি। আবার ভাবিয়াছেন বিষ দ্বারা, না—না—রাজ রাজেশ্বরীর তরঙ্গে ভাসাইয়া দেই, মরুক সে দুর্ব্বিনীতা —আমি তাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি।

বিদায়ের প্রাক্কালে কঙ্ক লীলাকে অনেকগুলি কাজের কথা বলিল—

রৈল রৈল লীলা তোমার তোতা শারী
ক্ষীর সর দিয়া তারে পালিও যত্ন করি।
রইল রইল রে লীলা পুষ্পতরু যত
জল সেচনি দিয়া পালিও অবিরত।
রইল রইল রে লীলা মালতীর লতা
আজি হতে রইল পইরা তোমার মালাগাঁথা।
সুরভি পাটলী রইলরে লীলা প্রাণের দোসর,
তৃণ জল দিয়া সবে করিও আদর।
আমার লাগিয়া তারা যদি হয়রে দুঃখমনা
গায়ে হাত বুলাইয়া করিও সান্ত্বনা।
গৃহের দেবতা রৈল রে লীলা শালগ্রামশিলা
শুদ্ধমনে পূজা তারে করিও তিন বেলা।
দেবের পূজায়ে লীলা হেলা না করিও
সর্ব্বনাশ ঘটিবে তবে নিশ্চয় জানিও।
তোমার আমার গুরু রে লীলা রহিলেন পিতা
জীবনে মরণে যিনি সাক্ষাত দেবতা।
এমন দেবের পূজায়ে লীলা না করিও হেলন
ইহ পরকাল নষ্ট নিশ্চয় মরণ।
অত্যাচার করেন যদি লইও শিরপাতি
নারায়ণে স্মরিও সদা অগতির গতি।
দুঃখ না করিও রে লীলা আমার লাগিয়া
আবার হইবে দেখা থাকিলে বাঁচিয়া।
আজি হ'তে মনে কইর কঙ্ক আর নাই
বিপদে করুন রক্ষা তোমাকে গোসাঞি।"

আমার অনুপস্থিতিতে যেন দেবতুল্য পিতার কষ্ট না হয়, শত উৎপীড়ণেও স্থির চিত্তে তাহার সেবা করিও।

ইহার পর কঙ্ক নিজের কথা ভাবিতেছিল,

"আবার ভাবেরে কঙ্ক আপনার মনে
কিরূপে বিদায় হব পিতার চরণে॥"

যাইবার সময় তাহার পূজনীয় পিতা, একদিন যিনি তাহার শ্মশান বন্ধু ছিলেন, তাঁহার চরণ দর্শন করিয়া যাওয়া কর্ত্তব্য কি না, কিন্তু এ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ, এ প্রশ্নের মীমাংসা করা তাহার পক্ষে সহজসাধ্য হইল না।

যৌবনশ্রী দৃষ্ট হয়। রোম গ্রীস মরিয়াছে, অনন্তকালের জন্য। কালচক্রের পরিবর্ত্তনে এক্ষণ 'বাঙ্গালীর' অভ্যুদয়ের সময় উপস্থিত। এই মহা সুযোগ যেন আমরা না হারাই। স্বদেশী আন্দোলনের ফলে আমাদের দৃষ্টি আবার যেন অতীতের শিক্ষা দীক্ষার দিকে অত্যধিক ভাবে আকৃষ্ট হইয়াছে, পূর্ব্বকার সন্ন্যাসী জীবন ও প্রাচীন অসারত্ব মূলক আদর্শ সমূহ অনেকের কাছে লোভনীয় চিত্তাকর্ষক বোধ হইতেছে। ফলে, আমরা দুই পদ অগ্রসর হইলে, এই সকল আদর্শের মোহে একপদ সরিয়া পড়িতেছি। হায়! মোহ কি ভাঙ্গিবে না? বাঙ্গালী কি মানুষ হইবে না?

জীবনাদর্শ পরিবর্ত্তন কর, সংসারে মনোনিবেশ কর ও বড় হইতে চেষ্টা কর। জাতিভেদ ভুলিয়া যাও, রমণীদিগকে মানুষ হইতে দেও, শিক্ষা প্রচার কর, দেশকে ভালবাস, দেশবাসীকে ভালবাস, কঠোর কর্ত্তব্যজ্ঞানী হও। বাঙ্গালী চাহা হইলেই তোমার ভাগ্যাকাশ মেঘমুক্ত হইবে, নচেৎ নয়। সাম্যের পথে, আলোর পথে, মিলনের পথে, অগ্রসর হও; সেই পথই আনন্দের পথ, উন্নতির পথ। তোমার অতীত যাহাই হৌক বর্ত্তমান উজ্জ্বল, ভবিষ্যৎ ততোধিক উজ্জ্বল—যদি পথ ভুলিয়া না যাও।

শ্রীবীরেন্দ্রকুমার দত্ত গুপ্ত।

সেরসিংহের ইউগণ্ডা প্রবাস।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রায় ২৫ বৎসর পূর্ব্বে আমি একবার কাশীতে একদল ত্রিশঙ্গীকে (মান্দ্রাজী) আগুনের উপর নৃত্য করিতে দেখিয়াছিলাম। প্রায় ৩০ মণ মোটা মোটা কাঠ জ্বালাইয়া উহাকে জলন্ত অঙ্গারে পরিণত করা হয়। তাহার উপর নৃত্য আরম্ভ করা হয়। নর্ত্তকেরা সকলেই সুধু পায়ে আগুনের উপর নাচিয়াছিল। অনেকেই উহা দেখিয়া বিশেষ বিস্মিত হইয়াছিল। হিন্দুদিগের মুখে শুনিলাম, বেদ শাস্ত্রের জোড়ে ঐ অদ্ভুত কার্য্য উহারা সম্পন্ন করিয়াছিল। কিন্তু আজ এই আফ্রিকার গভীর জঙ্গলের এক ক্ষুদ্র গ্রামে যখন পুনরায় ঐ ব্যাপার দেখিলাম তখন আমি প্রকৃতই অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। ব্যাপারটা বলি।

চতুর্থ দিবসে—(১৭ই ভাদ্র ৪টা সেপটেম্বর) আমরা বরি সাহেবের নিকট বিদায় হইলাম। বেলা প্রায় ৫টার সময় আমরা টেগিয়ে নামক এক বড় গ্রামে উপস্থিত হইলাম। গ্রাম খানি হ্রদের প্রায় অর্দ্ধ মাইল দূরে অবস্থিত। আমরা সে দিবসের জন্য ভ্রমণ ঐ খানেই স্থগিত করিলাম। নৌকা তীরে লাগাইবা মাত্র সাহেব দুই জন, রতি ও আমি গ্রামে প্রবেশ করিলাম। দোভাষীর কাজ করিবার জন্য একজন মাঝিকে সঙ্গে লওয়া হইল। গ্রামের মধ্যে একটা খোলা ময়দানে দেখি প্রায় এক হাজার লোক জমা হইয়া কি একটা ব্যাপারে লিপ্ত রহিয়াছে। অনুসন্ধানে শুনিলাম আজ রাত্রি ৮টার পর লোক জ্বলন্ত আগুনের উপর চলা ফেরা করিবে। এই সব কথাবার্ত্তা হইতেছে, এমন সময় গ্রামের প্রধান ঐ স্থানে উপস্থিত হইলেন, এবং বিশেষ বিনয়ের সহিত সাহেব দুই জন ও আমাদিগকে ঐ ঘটনা দেখিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন। সাহেবেরা সম্মত হইলেন। স্থির হইল যে সন্ধ্যার পর দুইজন লোক নৌকা হইতে আমাদিগকে ঘটনা স্থলে লইয়া আসিবে। ইহার পর আমরা ফিরিয়া আসিলাম ও তাড়াতাড়ি আহারাদি শেষ করিয়া প্রস্তুত হইলাম। কাপ্তেন সাহেবের পরামর্শে দুই জন শিখ আমাদের সঙ্গে যাইবে স্থির রহিল। আমরা প্রত্যেকে এক একটা ছয় নলা রিভলভার সঙ্গে রাখিলাম। তাহার পর যথা সময়ে প্রধানের দুই জন লোক উপস্থিত হইল। ইহাদের অঙ্গে কৌপীন ভিন্ন আর কোনও বস্ত্র দেখিলাম না। সর্ব্বাঙ্গ উল্‌কিতে ভরা। গলায় হাড়ের ও মাছের দাঁতের মালা। মস্তকে লম্বা লম্বা চুল। প্রত্যেকের হাতে একটা করিয়া বরছা। রতি আমাকে অস্ফুটস্বরে বলিল—"কি দুস্‌মন চেহারা! যেন যমদূত।"

যথা সময়ে আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিলাম। এক প্রকাণ্ড ময়দানকে বেড়া দিয়া ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। ঐ ঘেরা জমির মধ্যে দর্শকেরা সকলে ভূমির উপর বসিয়াছে। উহার মধ্যে আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই আছে। উহার ঠিক মাঝখানে এক খণ্ড জমিকে বেড়া দিয়া ঘেরিয়াছে। শুনিলাম, উহারই ভিতর অগ্নি-নৃত্য হইবে।

আশায় কত কাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হইবে ?” যে বৃক্ষ ফল ধরে না তাহা দিয়া হয় কি ? গাছে আম না ধরিলে কত দিন পরে গাছটী কাটীয়া ফেলিতে হয়, বাগান যাদের আছে তারা কি তাহা জানে না ? আচ্ছা, ‘শ্রীপ’ ত বৈষয়িক পণ্ডিত ; বলিতে পারেন, কয়টী দৃষ্টান্তে একটী ব্যাপ্তি নির্দ্ধারণ করা চলে ?

পরকীয়া প্রেমের কথা ‘শ্রীপ’ যাহা বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে আমি আপাততঃ কিছু বলিব না। আমি শুধু বিচার করিতেই বলিয়াছিলাম। ফলে বিচার করিয়া তিনি যদি উহা ভাল মনে করেন, তাহা হইলে আমি অন্তরায় হইব না।

অনশন বা অর্দ্ধাশনের কথার কি উত্তর দিব জানি না। ‘খেতে পাই না, কখন ভাবিব’— না ভাবার পক্ষে ইহা একটা মস্ত যুক্তি কিনা জানি না। সকলেই কি অনাহারে কষ্ট পায় ? তারা কেন ভাবে না ? ‘যেহেতু তোমার ইচ্ছা মত পোলাও খাইতে পাও না, সুতরাং তোমরা ভাল মন্দের চিন্তা কখনও করিও না’ —— দেশের লোককে এই উপদেশ দিতে আমি সম্মত নই। আর, অন্ন চিন্তাটাও দেশের ভাল মন্দের চিন্তার অন্তর্গত নয় কি ?

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মুকুল।

ফোটালে কে গো ঘুমান এই
মুকুলটীরে ?
সবুজ পাতার অন্তরালে
পরশ করে।
কত ঝড়ের কত ঘাতে,
কালো মেঘের বারিপাতে,
এম্‌নি করে ঘুমিয়েছিল
চুপ্‌টী করে,
ফোটালে কেগো ঘুমান এই
মুকুলটীরে।
কোন দেবতার অভিশাপে
অন্ধ ছিল এত কাল,
কেউ খোলতে পারেনিত
অন্ধ জনের আঁখি-জাল।
আজ বুঝি তার পুণ্য লগ্ন,
এলো বুঝি এলো আজ,
তোমার হাওয়ার পরশ পেয়ে
দৃষ্টি পেল বিশ্বমাঝ।

যাত্রাশেষে আঁধার ঘরে,
ধরলে তোমার প্রদীপটীরে,
ধন্য করে অন্ধ জনের দিলে
জীবনটীরে ;
তুমি ফোটালে কেগো ঘুমান এই
মুকুলটীরে।

শ্রীপ্রমোদচন্দ্র চৌধুরী।

সাগর সমাধি।

তিন দিন হইল খোকা আমায় চলিয়া গিয়াছে। আমার খেলার সাথী, জীবনের চির সম্বল, নিদ্রায় শান্তি, সব যেন খোকার সঙ্গে চলিয়া গিয়াছে। এই সুদূর দেওঘরে আমার যেন আর কেহ নাই, সব শূন্য, আর চারি দিকে একটা বিরাট হাহাকার। কি করি, কিছু ভাবিয়া পাই না ; স্বামী বোঝাতে আসেন, আর নিজেই কাঁদিয়া আকুল হন। ভাগ্যিস পাশের বাসায় দিদি ছিলেন, তাই রক্ষা। নহিলে আজ এমন করিয়া আমাদিগকে কে আঁকড়িয়া ধরিয়া রাখিত ? দিদি এই কয়দিন কিছু বলেন নাই, শুধু বুকে করিয়া রাখিয়াছেন। আর কি-ই বা বলিবেন, বলিবার ত কিছু নাই। কিন্তু আজ আর থাকিতে পারিলেন না, বলিলেন, “শৈল, দিদি আমার কেঁদ না।” তাঁহার স্বরে একটা আকুল বেদনা ফুটিয়া উঠিতেছিল। মনে বড় দুঃখ হইল, বলিলাম, “দিদি, আজ যে আমার কেউ নাই—আজ

কাননের মাঝে আসি বনদেবী রূপে।”
দুলাইতা কর্ণিকার শ্রবণ যুগলে,
যূথিকার গাঁথি মালা পরাইতা গলে,
কেশ পাশে বাঁধিতা শিরীষ।
হিমানীর
শেষে যবে জনপদ বধূ, দিন গণি
যাপিত দিবস, ভাবিত উঠিবে বাজি
মুকুলিত চূত মঞ্জরীরে বেড়ি কবে
বসন্তের চরণ মঞ্জীর —ভ্রমরের
গুঞ্জরণে, তবু যদি না ফোটে অশোক,
নূপুর লাঞ্ছিত মোর চরণ আঘাত
করিতাম রুক্ষদেহে তার ; ফুলে ফুলে,
সুষমায়, উঠিত সে হাসি।
বসন্তের
শুক্লা ত্রয়োদশী। মত্ত জনপদবাসী
বসন্ত উৎসবে, ছুটিত কানন পানে
আবীরে কুঙ্কুমে রঞ্জিত বিচিত্র বাস ;
জন পদ বধূ, নব চূত মঞ্জরীরে
দুলা'য়ে শ্রবণে, মিলিত সেথা'য় আসি ;
অশোকের তল উঠিত মুখর হ'য়ে
নূপুর নিক্কণে, কিঙ্কিণির রিণি রিণি,
কল হাস্যে গীতে। প্রিয়জন কণ্ঠালিঙ্গনে
লঙ্ঘিত বিশ্রাম নৃত্য শ্রান্ত কেহ বালা ;
দুলিত তরুণ, প্রিয়ভুজ আবেষ্টিত
কণ্ঠে হিন্দোলায় ; কেহ নব চূতাঙ্কুরে
প্রদানি অঞ্জলি মাগিত অভীষ্ট বর
মনোভব পাশে—নিজ মনোমত পতি।
মিলিতাম দোহে আসি সেই সুখ স্রোতে ;
দুলিতাম হিন্দোলায়, হিল্লোলে হিল্লোলে
লুটিত বসন প্রান্ত, এলাইত কেশ,—
সভয়ে নয়ন মুদি কটি খানি তার
ধরিতাম জড়াইয়া। কভু নৃত্য শ্রমে
আরক্ত কপোলে চাহি কহিতেন হাসি,
“অশোকেরে আজ তুই দিয়েছিস লাজ।”
উড়িছে যে প্রজাপতি কুসুমে কুসুমে
আপনার সুখে রূপে আপনি বিভোর—
শুধু দুদণ্ডের খেলা। কে জানিত সবি
শুধু স্বপ্ন, মরীচিকা, মিথ্যা, মায়া, মোহ।

৫।

এ সুখে অতৃপ্তি আছে, আছে অবসাদ।
কাটায়েছি কত যামী নয়ন মদিরা
পান করি—মিটেনিক' তৃষা। বুঝিলাম
চিরন্তন হাহাকার এ যে মাতৃ স্নেহ
অতৃপ্ত যেথায়।
একদিন গৃহে মোর
অসেছিল চাঁদ! সহসা মেলিয়া আঁখি
দেখিলাম আজি মাতা আমি! স্তনযুগে
বহে ক্ষীরধারা! ত্রিদিব সুন্দরি কোন
গগনের পথে চলে'ছিলা, অসম্বৃত,
কবরী হইতে বিচ্যুত মন্দার এক
পড়িয়াছে খ'সি বুঝি মোর বক্ষ পরে।
কি সুন্দর মুখখানি! চেয়ে চেয়ে আঁখি
ভুলে গেল! মুখে মাখা বিশ্বজয়ী হাসি!
ঈষৎ আরক্ত দেহ, কুসুম কোমল,
যেন সুষমায় ঘেরা অরবিন্দ এক!
হাত দুটি মুষ্টিবদ্ধ—চম্পক কোরক!
নীল নেত্রে—স্বর্গের স্বপন! চেয়ে থাকি,
বুকে রাখি মিটিল না তৃষা!
যায় দিন,
বর্ষ, মাস। ফুটিল যে দিন শিশু মুখে
অর্দ্ধস্ফুট প্রথম কাকলী, ভাবিলাম
শুনিতেছি স্বর্গের বীণার একখানি
সুর রেশ,—অপ্সরার চরণ মঞ্জীর!
উন্মুক্ত প্রাঙ্গন মাঝে প্রথম যে দিন
শিশু মোর টলি' টলি' লাগিল চলিতে,
ভাবিলাম ক্ষুদ্র দুটী কোমল চরণে
বুঝি বা বাজিছে ব্যথা কঠিন কঙ্করে ;
মনে হ'ল হৃদিখানি দিই বিছাইয়া
পদতলে তৃণাস্তীর্ণ বীথিকার মত!
অপরাহ্নে একদিন প্রচ্ছায় নিবিড়

চৌত্রিশ আছে। তিনি কতকাল সহিবেন? মা দুর্গা তাই এতদিনে আমাদের আনন্দোৎসব পণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছেন। আশ্বিনে আর কোন দিন বৃষ্টি হয় না, আকাশ পরিষ্কার, মাঝে মাঝে শুধু মেঘের নিষ্ফল গর্জ্জন। কিন্তু হায়, যত জল জমিয়া থাকে কেবল ঐ পূজার কয়দিনের জন্য। প্রায় প্রতি বছরই দুর্গোৎসবের সময় অবিশ্রান্ত বৃষ্টিপাতে ভক্তদের আমোদরূপ উৎসাহের জলন্ত বহ্নি একদম নিবিয়া যাইতেছে। গেল বছর বাবুরা কত ব্যয় করিয়া কলিকাতা হইতে থিয়েটার যাত্রা গান আনাইয়াছিলেন, চর্ব্বা চোষ্যের বিরাট আয়োজন হইয়াছিল; কিন্তু ঝড় বৃষ্টির গতিকে সবই মাটি হইয়া গেল। ভাসানের সে আমোদ নাই; জলে ভিজিয়া কে বাপু জ্বরে ভুগিবে? আর বঙ্গে তো এই সময় হইতেই জ্বরের ধুম। তাই বলিতেছিলাম, শরৎ ঘোর অকাল। মা, কে অকালে ঘুম হইতে তুলিয়া ভোগের রান্না খাওয়ানর চেষ্টার এই ফল। এবার মা আসিতেছেন কার্ত্তিক মাসে। বোধ হয় ধনুঃশর লইয়া শীকারী কার্ত্তিক তাঁহার অগ্রে, বিঘ্ননাশন গণপতি বুঝি পুরোভাগে নাই; কি হয় বলা যায় না।

হাঁ, ঋতু যদি বলিতে হয়, তবে পঞ্চম ঋতু শীতকাল। যত ইচ্ছা আমোদ প্রমোদ, খাও দাও, মজা কর, বাধা বিঘ্নের সম্ভাবনা নাই। বিলাতে রাজার করোনেসন যে মাসেই হোক, এ দেশে আমোদ উৎসব জানুয়ারী কি ডিসেম্বরে। যীশুখ্রীষ্ট ও বাছিয়া বাছিয়া ভাল সময়ে (বড় দিনে) জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর আমাদের শ্রীকৃষ্ণ? সে দুঃখের কথা, দাদা, বলিয়া কাজ নাই। কিষ্টোজী তো জন্ম নিয়েই খালাস, কিন্তু ভুগিতে ভোগে ভক্তেরা। ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিসিলওয়ালাগণ কাতর দৃষ্টিতে যখন আকাশের দিকে অনুক্ষণ তাকাইয়া থাকে। তখন তাঁহাদের দুঃখে আকাশ ও অনর্গল অশ্রুপাত করে। — ভাই সব, শীতের সময় আহারে বিহারে কি আরাম। কমলালেবু, কুল, কপি, কলাইশুঁটি, কই কাঁকড়া প্রভৃতি পঞ্চ ককার খকারে কলিকাতা সহর কল কল ঢল ঢল।

ছয় ঋতুর মধ্যে শীত সবার সেরা কেন? ৫এর সম্পর্কে। পঞ্চম ঋতু বলিয়া। জ্ঞানাৎ পরতরং নহি। এই জ্ঞানের অধিকার হয় পঞ্চম বর্ষ হইতে যখন শিশুর হাতে খড়ি দেওয়া হয়। জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী শ্রীপঞ্চমী দেবী পঞ্চম ঋতুর পঞ্চমী তিথিতে শুভাগমন করিয়া ৫এর প্রাধান্যই প্রচার করিতেছেন। বসন্তকাল কবিগণ এত পছন্দ করেন কেন? পিকের পঞ্চম তান ও অনঙ্গের পঞ্চবাণ আছে বলিয়া। ৫ আছে তাই। নহিলে কেবল Smallpox এর খাতিরে কবি রাজ বা কবি-সম্রাটেরা বসন্তের এত আদর করিতেন না।

মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট ও পতঙ্গ এই পাঁচ রকম সৃষ্টি। ইহারা এসিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা ও ওসেনিয়া পঞ্চ মহাদেশের সর্ব্বত্র ডাহিনে বামে, সম্মুখে, পেছনে ও মাঝখানে ঘিরিয়া রহিয়াছে। সৃষ্ট জীবের মধ্যে যে সর্ব্বপ্রধান মনুষ্য তাহারা পঞ্চজাতি; ককেশীয়, মঙ্গলীয়, নিগ্রো, আমেরিক ও মালয়ান। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ ককেশীয়, তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভারতীয় আর্য্য। এই আর্য্যেরা সব দেশ ছাড়িয়া, বাছিয়া বাছিয়া প্রথমতঃ পঞ্চনদযুক্ত পঞ্জাব দেশটা পছন্দ করেন। ভারতীয় আর্য্যদের মধ্যে প্রধান বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ। ইঁহারা আদিশূরের নিমন্ত্রণে কনোজ হইতে আগত পঞ্চগ্রাম প্রাপ্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণের সন্তান। পঞ্চ ব্রাহ্মণের সঙ্গীয় পঞ্চ কায়স্থও বঙ্গে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। আদিশূরের পর বল্লালসেন কৌলিন্য স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করেন। যথা—রাঢ়, বাগড়ি, বরেন্দ্র, বঙ্গ ও মিথিলা। মহাভারতীয় যুগেও সম্রাট বলির পঞ্চপুত্রের নামানুসারে পঞ্চদেশ ছিল।

অঙ্গো বঙ্গঃ কলিঙ্গশ্চ পুণ্ড্রঃ সুহ্মশ্চ তে সুতাঃ।
তেষাং দেশাঃ সমাখ্যাতাঃ স্বনামকথিতে ভুবি॥

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ৫০ অধ্যায়)

পাঁচের প্রভাবে এখনকার জোড়া বঙ্গেও পঞ্চবিভাগ। যথা, বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি, রাজসাহী, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ই বল আর কর্ম্মেন্দ্রিয়ই বল, ইন্দ্রিয়ের সেট পাঁচ পাঁচটী করিয়া। এই কর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে কর্ম্মযোগই গীতার উপদিষ্ট, মা ফলেষু কদাচন। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় মধ্যে হস্ত সর্ব্বপ্রধান। হাত দিয়া অস্ত্র ধরিতে হয়, কলম ও লাঙ্গল চালিতে হয়, এমন কি চিমটি পর্য্যন্ত কাটিতে হয়। চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইতে হইবে কি, এ হেন হাতে পাঁচ

পাঁচটি আঙ্গুল? পঞ্চাঙ্গুলি বিকল হইলে পূজা অর্চ্চনা, জপ তপ নিষ্ফল, কারণ গালিনী ও ভূতনি মুদ্রা হইবে কিরূপে?

তুমি বলিতে পার, উত্তমাঙ্গই প্রধান ও কর্ত্তা, পঞ্চাঙ্গুলি বিশিষ্ট হস্ত আজ্ঞাবহ ভৃত্য মাত্র। তোমার উত্তমাঙ্গেও পঞ্চযোগ, কারণ বিধাতা প্রাণীদের এক মুণ্ডের ভিতরেই চক্ষু কর্ণ নাসিকা প্রভৃতি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের ঠাঁই দিয়াছেন। আবার তুমি বলিতে পার, প্রাণীদের প্রাণই আসল, মাথাটা থাক্ বা নাই থাক্। প্রাণেও পাঁচের প্রভুত্ব। দেহস্থ পঞ্চ বায়ুর নাম প্রাণ বা প্রাণাং। এই পাঁচে পাঁচ মিশিলেই দফারফা, একেবারে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি। তখন কবিরাজী পঞ্চতিক্ত পাঁচন বড়ি সম্পূর্ণ বিফল। পঞ্চভূতের উল্লেখটা এখানেই করিয়া রাখি। যে জীবিত সে বর্ত্তমান। যে মৃত সে ভূত। সুতরাং মরিলেই ভূত হয়। আবার বাঁচিয়া থাকিলেও জীবিত ভূতগুলি অহনি অহনি গচ্ছন্তি যম মন্দিরং। সুতরাং বড়ই সমস্যা।

প্রাণ তো গেল, এখন আত্মা? আত্মা পঞ্চকোষের অন্যতম। এখানেও পাঁচের প্রতাপ। সুষুপ্তিকালে পঞ্চকোষের মধ্যে আনন্দকোষ অবশিষ্ট থাকে এবং তাহার নাম আত্মা। চৈতন্য প্রভৃতি আত্মার পঞ্চগুণ। সাংখ্য পাতঞ্জল বেদান্তকার প্রভৃতি ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ভগবান কপিল প্রভৃতি ষড়্দার্শনিকেরা পরস্পর ষড়যন্ত্র করিয়া শেষে অন্যরূপ মীমাংসা করিলেও, বৈষ্ণব দর্শন "পঞ্চরাত্র" গ্রন্থে, পঞ্চ তন্ত্রের উপদেশে এবং পঞ্চানন পণ্ডিত কৃত শাস্ত্রগ্রন্থে আত্মার পঞ্চগুণেরই বিশেষ আভাষ ও ইঙ্গিত লক্ষিত হয়। ছয় হইতে বোঝা হয় পাঁচই (আধ্যাত্মিক ভাবে) বড়। যাঁরা তাস খেলেন তাঁরা জানেন ছক্কা হইতে পাঞ্জার বনিয়াদ বেশী শক্ত। আমরা কথায় কথায় ছয়কে ইচ্ছা করিয়াই বর্জ্জন করি। যথা "পাঁচ সাত দশজন"। "সাত পাঁচ ভাবনা"। বাপ বড়, তাই বাপের নাম পঞ্চানন, ছেলের নাম ষড়ানন।

সনাতন হিন্দুধর্ম্মের পঞ্চ সম্প্রদায়। ব্রহ্মার ধর্ম্ম ব্রাহ্ম, বিষ্ণুর ধর্ম্ম বৈষ্ণব, আর শিবের পারিবারিক ধর্ম্ম শৈব, শাক্ত ও গাণপত্য। মোট পাঁচ। ভক্তি পঞ্চবিধ। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মাধুর্য্য। যথা চৈতন্য চরিতামৃতে :—

ভক্ত ভেদে রতি ভেদ পঞ্চ পরকার।
শান্তরতি দাস্যরতি সখ্য রতি আর॥
বৎসলা রতি মধুর রতি এ পঞ্চবিভেদ।
রতি ভেদে কৃষ্ণ ভক্তি রস পঞ্চভেদ॥

শ্রীকৃষ্ণ পঞ্চআত্মা, তৎপ্রতি সমত্ব-বিহীন অনুরাগের নাম শান্তরতি। সনকাদি ভক্তের শান্তরতি। শুক সনাতনের দাস্য, শ্রীদামাদি রাখাল দের সখ্যরতি এবং বৃদ্ধা গোপীদের নাড়ু গোপাল মূর্ত্তির প্রতি বাৎসল্য রতি। লালন, পালন, চিবুক স্পর্শন, মস্তকাঘ্রাণ শুভাশীর্ব্বাদ—এই পঞ্চ বাৎসল্য ভাব। কিন্তু জয়দেবের সময় হইতে বঙ্গে মাধুর্য্য-রতির মাধুর্য্যই বেশী কীর্ত্তিত। আপনাকে রাধা জ্ঞান করা। ইহাতে ইষ্টক স্মরণ কীর্ত্তন লাগাইয়া ক্রিয়া নিষ্পত্তি অষ্ট সোপান থাকিলেও কটাক্ষ, ভ্রূভঙ্গি, প্রিয়বাণী, মন্দহাস্য এবং অবশেষে সহসা হস্ত ধারণ এই পঞ্চ চেষ্টার অভ্যাস কাব্যে বর্ণিত আছে।

ভক্তির পর মুক্তি। সালোক্যাদি পঞ্চবিধ মুক্তি সকলেই জানেন। অথ বৈষ্ণব স্বীকৃত পঞ্চতত্ত্ব। নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, গদাধর, শ্রীবাস এই চারি তত্ত্ব; গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু মূলতত্ত্ব। মিলিয়া পঞ্চ তত্ত্ব। "তত্ত্বমসির" ভিতরেও পঞ্চ তত্ত্ব আছে। এখনকার দিনে সন্দেশের সঙ্গে জামাইয়ের ধুতি চাদর, কন্যার সাড়িও সেমিজ এই পঞ্চ দ্রব্যই আসল তত্ত্ব।

ধর্ম্মের ন্যায়—পাপের দিকেও পাঁচের প্রতাপ। এই দেখুন, অন্ততঃ পাঁচ জন একত্র না হইলে দাঙ্গা হাঙ্গামা বা ডাকাইতির মত একটা ছোটখাট পাপকর্ম্মও হইতে পারে না।

ধর্ম্মশাস্ত্র ছাড়িয়া কাব্যও দেখ। পঞ্চবটীর বনে সীতা হরণ কাণ্ড লইয়া বাল্মীকির মহাকাব্য। পঞ্চ পাণ্ডব ও পাঞ্চালীর বিবরণ লইয়া মহাভারত। প্রথমে পাঁচ খানি গ্রাম চাওয়া হইয়াছিল তাহাতেই উত্তর হইল "সূচ্যগ্রেণ··· বিনাযুদ্ধেন কেশব"। তৎক্ষণাৎ ধর্ম্মক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে কেশবের পাঞ্চজন্য ভেরীর বিকট আওয়াজ ও ভীষণ লড়াই। কেবল কাব্য কেন, পাঁচ জনে মিলিয়া—গান বাজানা ও ছড়া কাটিলেও পাঁচালি হয়। যথা দাশুরায়ের পাঁচালি।

কাব্যের সঙ্গেই অলঙ্কার। চাণক্য কবি বলিয়াছেন

চির দিনের শান্ত সুবোধ বিমলাকান্ত আজ পাগলের পরিচয়ে হাজতে প্রবেশ করিল।"

(৪)

'ডাক্তারখানায় আমার পরীক্ষা আরম্ভ হইল। এইখানে আমি হঠাৎ একবার পঞ্চানন্দ বাবুকে দেখিতে পাইলাম। মুহূর্ত্তে বুঝিলাম, আমার এই দুর্গতির কারণ এই মহাত্মা। ক্রোধে আমার আপাদ মস্তক জ্বলিয়া উঠিল। রোষ দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া কহিলাম—

"যার ভয়ে বৈজয়ন্তে শচীকান্ত বলী
চির কম্পমান তুমি, হত সে রাবণি
তোমার কৌশলে আজি অন্যায় সমরে।"

ডাক্তারখানার ছাত্রগণ উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল। অর্থাৎ আমার ঐ উক্তি আমার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিল মাত্র।

ডাক্তার পরীক্ষ করিতে আসিলে আমি আমার দুঃখের কাহিনী নিবেদন করিতে চাহিলাম; তিনি সে দিকে বড় মনোযোগ করিলেন না। বুঝিলাম পঞ্চানন্দ বাবুর সহিত তাহার কাণাকাণি হইয়াছে। বড় দুঃখে কহিলাম—ডাক্তার বাবু, আপনি কি বিবেককে এতই সামান্য মনে করেন? মনুষ্যত্ব, সত্যপ্রিয়তা কি দুনিয়ায় নাই?

ডাক্তার মৃদু হাসিয়া কহিলেন "তোমার শ্বশুর তোমার জন্য দুঃখ করে গেছেন। মা বাপ মরা তোমাকে তিনি পুত্রের মত পালন করেছেন;—আজ তোমাকে গারদে—

"কে আমার শ্বশুর?—ওই পঞ্চানন্দ! ইতর বেটা, নরকের কীট—বলে আমার মা নেই?—আশ্চর্য্য। ডাক্তার বাবু আমার মা আছেন। তাকে একটা সংবাদ দিই—আমার শ্বশুরকে একটা সংবাদ দি—কলেজে"—

"তোমার শ্বশুর স্বয়ংই এখানে আছেন। মনের দুঃখে তোমার নিকট আসতে পাচ্ছেন না। তিনি কাঁদছেন।"

রাগে আমার কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান লোপ হইয়াছিল। কহিলাম—"ডাক্তার বাবু, সঞ্জীব বাবুর "জাল প্রতাপ চাঁদ" খানা একবার পড়বেন। আমি ভাবি নাই যে আমার উপর এমন ভীষণ একটা ঘটনা এসে পড়বে যাক্—আমাকে মুক্ত করুন। আমি ঘরের ছেলে ঘরে যাই।"

"তোমাকে যখন সম্পূর্ণ সুস্থ মনে করব, তখনই তোমাকে ছেড়ে দেওয়া যাবে।"

"তবে কি আমি সত্যি সত্যিই পাগল।"

"নিঃসন্দেহ।"

"বটে! হায় মহাকবি সেক্সপীয়র হায় মানব-হৃদয় গ্রন্থের অদ্বিতীয় পাঠক! তুমি নির্য্যাতন গ্রস্ত টাইমনের মুখদিয়া যে অভিশাপ স্রোত বহাইয়াছিলে; আজ আমি তাহা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিয়াছি। ডাক্তার ডাক্তার আমায় মুক্ত কর। এই নিকৃষ্ট অভিনয় আমি আর——"

"গণ্ডগোল বড় বাড়াচ্ছ বাপু? উন্মাদের প্রলাপ বৃদ্ধি সুলক্ষণ নয়।"

"তবে কি আমার পক্ষে কারাগার অনিবার্য্য।"

"নিশ্চয়।"

"এখানে কি এমন কেউ নাই।—এই পঞ্চাশ জন দর্শকের মধ্যে এমন একটী প্রাণীও নাই—যে এই নির্দ্দোষ নিরীহ নিপীড়িতের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করে?"

কেহ শব্দ করিল না।

ডাক্তারের আদেশ হইল—"ইহাকে গারদে লইয়া যাও।"

মহাশয় প্রকৃত পাগলের মত আমি কাঁদিয়া উঠিলাম। প্রকাশ্য দিবালোকে, ন্যায় পরায়ণ ইংরেজ রাজার রাজত্বে শত চক্ষুর সম্মুখে আজ একটা ভীষণ মিথ্যা কাণ্ড সত্যের আবরণে চলে যাচ্ছে। হায় ভগবান! তুমি আছ? চেয়ে দেখ্‌ছ না কি? ডাক্তার! ডাক্তার,—টাইমনের ভাষায় আমি ও অভিশম্পাত কর্‌ছি;—

* * * *

কিছুতেই কিছু হইল না। ডাক্তার মৃদুস্বরে কহিলেন—'ছেলেটা লেখা পড়া শিখে পাগল হয়ে গেল'।

"সেই হইতে আমি এখানে আছি। মাকে, শ্বশুরকে, বন্ধু বান্ধবকে সংবাদ দিতেও অক্ষম। আপনি যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমার এক আধটু সাহায্য করেন, চিরদিনের জন্য কৃতজ্ঞ থাকিব।"

আর মহাশয় আমার অপহৃতা হতভাগিণী পত্নীর একটা সন্ধানের ভারও আপনার উপরই প্রদান কচ্ছি। আপনি আমার বন্ধু কি শত্রু জানি না। কিন্তু—

"মজ্জমান জন,
ধরে তৃণে, যদি কিছু না পায় সম্মুখে।"

আপনি আমার জন্য একটু কিছু করেন, এই প্রার্থনা।'

"ইঁদুর বিনাশিনী সভা" স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পূজায় গিয়া তণ্ডুল কণা লাভের পরিবর্ত্তে পৈত্রিক প্রাণটা বিলাইয়া আসা কখনই লাভ জনক নহে।"

পুত্রদ্বয়ের কথা শুনিয়া ভোলানাথ নিরুপায় হইলেন। তিনি মহামায়াকে ডাকিয়া কন্যাদ্বয়ের মত লইতে পাঠাইয়া দিলেন।

ভগবতী যাইয়া লক্ষ্মীঠাকুরাণীকে নিজ কক্ষে পাইলেন না। পেচক তাঁহাকে পথ দেখাইয়া একটী ক্ষুদ্র কক্ষে আনিয়া হাজির করিলেন। তথায় লক্ষ্মী ঠাকুরাণী তারহীন তাড়িত বার্ত্তার চোঙ্গা কাণে লাগাইয়া বসিয়া ছিলেন। মাকে দেখিয়া উঠিয়া আসিয়া যথা বিহিত অভ্যর্থনা করিলেন। তখন ভগবতী মর্ত্তে যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। মায়ের কথায় লক্ষ্মী ঠাকুরাণীর মনের রুদ্ধ চাপ সরিয়া গেল। তিনি বলিতে লাগিলেন "মা মর্ত্তের কথা কি আর বলিব! সেখানে আমার যাওয়া হইবে না—এবার তো কর্ত্তা বাড়ী নাই—যাইতেই পারিব না—ইহার পরও আর যাইতে ইচ্ছা করি না। লক্ষ্মী ছাড়া দেশে আমার স্থান নাই।" কিছুক্ষণ থাকিয়া লক্ষ্মী পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"মা, ইয়ুরোপের যুদ্ধের প্রাক্কালে কর্ত্তা এক দিন আমাকে বলিয়াছিলেন —লক্ষ্মী, ইয়ুরোপের এই ভীষণ যুদ্ধে জগতের যে লাভ হইবে, তাহার মধ্যে দুইটী লাভই আমাদের পক্ষে ইষ্টজনক। এক আধুনিক বলদৃপ্ত নাস্তিক ইয়ুরোপে আমার প্রভাব বৃদ্ধি, অপর পতিত ভারতের শিল্প বাণিজ্যে তোমার প্রতিষ্ঠা।" ইহার কিছুদিন পরেই ইয়ুরোপে তাঁহার ডাক পড়িয়া গেল। গিরজায় গিরজায় উচ্চকণ্ঠে শত্রু মিত্র সকলেই ভগবানের নাম লইলেন। তখন সাধ্য কি তিনি বৈকুণ্ঠে বসিয়া থাকেন। এই ৩বৎসর তাঁহার আহার নিদ্রা নাই; গরুড়েরও খাটুনী অসম্ভব বাড়িয়া গিয়াছে। দু'পরে খাইতে বসিয়াছেন টেলিগ্রাফের ঘণ্টা ডং ডং করিয়া বাজিয়া উঠিল, নিশীথে সুস্থ মনে নিদ্রা যাইবার যোটী নাই—ভক্তের ডাক, ভক্তের অধীন ভগবান—এই তিন বৎসর দেশ দেশান্তরে যে কি হইতেছে তাহার খোঁজ নাই—তিনি যাইবার সময় বলিয়া গিয়াছিলেন—আমি যাই, মর্ত্তে তোমার অক্ষয় প্রতিষ্ঠা হইবে। কিন্তু মা, তিনি যাইতে না যাইতেই মর্ত্তের জাতীয় ধনাগারে দিনে ডাকাতি হইয়া গেল, শিল্পশালার অর্থে তুলা ক্রয়ের পরিবর্ত্তে ডিরেক্টারগণের মটরগাড়ী খরিদ হইতে লাগিল, বাণিজ্যের ভরা নৌকা দরিয়ায় ডুবাইয়া নায়কগণ শিল্প বাণিজ্যের সপিণ্ডকরণ করিলেন। এখন বাকী রহিয়াছে—" বলিতে বলিতে লক্ষ্মী কাঁদিতে লাগিলেন। এমন সময় সুমধুর স্বরে কলের ঘড়ি বাজিয়া উঠিল, লক্ষ্মী চোঙ্গা কাণে দিয়া শুনিয়া বলিলেন—"মা এই শুনুন জাপানের শিল্প ও বাণিজ্যশালায় আমার স্তুতি কি উচ্চকণ্ঠে শুনা যাইতেছে। এই বলিয়া সেই বিনাতারের টেলিগ্রাফের চোঙ্গিটী ভগবতীর হাতে প্রদান করিয়া বলিলেন—"না মা, যেখানে সম্মান নাই, পরন্তু অপমানের শেষ নাই, সেখানে কে যাইতে চায়। আমি জাপানের জন্য প্রাণ ঢালিয়া দিয়াছি। নারায়ণ ইয়ুরোপে গিয়াছেন। অতঃপর ঈশ্বর বিশ্বাসে ইয়ুরোপ ও বাণিজ্যে জাপান মর্ত্তে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিবে—ইহাই আমার বিশ্বাস।"

ভগবতী সরস্বতীর নিকট আসিলেন। বাগ্বানী তখন বিশ্বের শিক্ষা প্রণালীর সহিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের শিক্ষা প্রণালীর তুলনা করিতেছিলেন। মাতাকে দেখিয়া তাঁহার সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। তারপর মায়ের প্রস্তাবের উত্তরে—বলিলেন, "আমি যাইব না, মা, যাইতে হয় তোমরাই যাও। যে দেশের লোক অর্থের জন্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে চায় এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রশ্ন পত্র চুরি করে অথবা বাড়ী হইতে প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া আনে, সে দেশে আমার যাওয়ার কোনই প্রয়োজন নাই। যে এরূপ করিতে পারে, সে মায়ের ধনেও লোভ করিতে পারে—আমার এ বীণাটীর এখনও Patent হয় নাই। মূর্খেরা যেরূপ আদর্শে শিক্ষা লাভ করিতেছে, সে আদর্শ ফলাইলে আমার আর উপায় থাকিবে না। তস্কর শিষ্য অপেক্ষা সাধু অভক্তের সহবাস নিরাপদ।"

মা ভগবতী পুত্র কন্যাগণের কথা শুনিয়া অবাক্! কি করেন কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিতেছেন না। নিজেরও মনে মনে পূর্ব্ব হইতেই মর্ত্তে যাইতে একটু ভয়ের কারণ ছিল, এখন পুত্র ও কন্যাগণের কথা শুনিয়া সে ভয় আরও ঘনাইয়া উঠিল। সুযোগ পাইয়া তিনি শঙ্করের নিকট যাইয়া বলিলেন। "নাথ! আমার দশটী

ছেলেমেয়েদের সম্মতি জানিয়া ভগবতীর আর অসম্মতি রহিল না। অস্ত্র শস্ত্রাদি বর্জ্জিত হইয়াই মর্ত্তে আসিবেন স্থির করিলেন। দেবগুরু বৃহস্পতি বহির্ব্বাটিতে ফিরিয়া আসিয়া নন্দী ভৃঙ্গীকে মর্ত্তে না যাইবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা আমতা আমতা করিতে লাগিল। কেহ ২ বলিল—"কর্ত্তা ইচ্ছা কর্ম্ম"। বৃহস্পতি বলিলেন "তথাস্তু"।

সর্ব্বশেষে পুরোহিত ঠাকুরের ডাক পড়িল। পুরোহিত শুক্রাচার্য্য বাড়ীতে নাই। নন্দী জানিয়া আসিয়াছে, তিনি পিতামহ ব্রহ্মার, পিতার 'একোদিষ্ট সপিণ্ডন' করাইতে গিয়াছেন। গিন্নী বলিয়া দিয়াছেন, বৈকাল বেলায় একবার গিয়া দেখা করিয়া আসিবেন। পুরোহিতের জন্য বৃহস্পতি ঠাকুরের অপেক্ষা করিতে হইল।

বৈকালে পুরোহিত ঠাকুর আসিলে বৃহস্পতি বলিলেন,—"এবারের প্রায়শ্চিত্তের পূর্ব্বেই তোমার দক্ষিণার বকেয়া পাওনা পরিষ্কার হইবে। পূজায় গিয়া ভোলানাথ শ্বশুর বাড়ী হইতে যাহা কিছু আনিতে পারিবেন, তাহা তোমাকেই দিবেন। আজকাল সিদ্ধির খরচ চালানই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে, তদুপরি রোজই কিছু কিছু দুগ্ধ সেবন করিতে হয়, নতুবা স্বাস্থ্য হানির সম্ভাবনা। পয়সার খুবই অনাটন, সেই জন্যই তোমার দক্ষিণার পয়সা বাকী পড়িয়াছে। তাহা হইলেও কি আর যজমানকে আটক দিতে হয়? "হরে' 'পুরে' করে 'হিত' তাঁর নাম পুরোহিত।" এই মহাজন বাক্যের সার্থকতা রাখিয়া চলিও।"

পুরোহিতকে নানা প্রকার উপদেশ দিয়া গুরুদেব গাত্রোত্থান করিলেন। পুরোহিত প্রবরও যজমানকে আটকের ভয় হইতে অব্যহতি দিয়া প্রস্থান করিলেন।

পূর্ব্ব সপ্তাহের "কল্পনা"র স্তম্ভে ভোলানাথের পারিবারিক গোলযোগের এইরূপ বিস্তৃত সংবাদ পাঠ করিয়া মর্ত্তবাসী মহা দুশ্চিন্তায় পড়িয়াছিল। এখন সেই পত্রেই "গোলযোগ মিটিয়া গিয়াছে।" এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া মর্ত্তবাসীর আর আনন্দের পরিসীমা নাই। আপত্তির কারণগুলি যে আমাদের দুর্ণিবার কলঙ্ক চিরকাল ঘোষণা করিবে—তাহা প্রক্ষালনের কি কোন উপায় নাই?

শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী।

বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ।

(প্রতিবাদ)

গত ভাদ্র সংখ্যার সৌরভে শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্র কুমার দত্ত গুপ্ত এম্, এ, বি, এল, মহাশয়ের "বাঙ্গালীর ভবিষ্যৎ" শীর্ষক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছিল। আমরা এই প্রবন্ধটীর কয়েকটী প্রতিবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রতিবাদ গুলির অধিকাংশই ব্যক্তিগত আক্রমণে কলুষিত। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ দত্ত গুপ্ত যে প্রতিবাদটী পাঠাইয়াছেন, তাহার কতকাংশ নিম্নে প্রদান করিলাম। সৌঃ সঃ।

জাতি ভেদ প্রথা তিরোহিত না হইলে বাঙ্গালীর উন্নতি হইবে না। তাই লেখক জাতি ভেদ তুলিয়া দিয়া একত্র আহার বিহারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জাতি ভেদ না থাকাই যদি উন্নতির কারণ হয়, তবে মোগল পাঠান উন্নতির অম্বর চুম্বিত সৌধ-শিখর হইতে অবনতির পঙ্কিল হ্রদে নিপতিত হইল কেন? গ্রীসিয়ান দের শৌর্য্য-বীর্য্য ধ্বংস হইবার কারণ কি? রোমকগণ কোন জাতি ভেদ বিষানলে পরিদগ্ধ হইয়াছিল? লেখক বলেন বহু ঈশ্বরবাদী ও বহু জাতিতে বিভক্ত বলিয়া এবং বিধবা বিবাহ অপ্রচলিত থাকা নিবন্ধন রমণীগণ উচ্চ শিক্ষা ও স্বাধীনতা লাভে বঞ্চিতা থাকায় হিন্দুগণ পরস্পর একতা লাভে অসমর্থ, তজ্জন্যই তাহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদের সৃষ্টি হইয়া তাহাদের উন্নতির পথ সঙ্কোচিত হইয়া পরিয়াছে। একেশ্বর বাদী, জাতি ভেদ পরিশূন্য জার্ম্মেণ জাতি, সম ধর্ম্মী ও সম গুণান্বিত ইংরেজ ফরাসী প্রভৃতির প্রতি এরূপ বিজাতীয় বিদ্বেষ পোষণ করিতেছে কেন? স্বাধীনতা প্রাপ্তা, রমণী গণের ও পুনর্ব্বিবাহিতা বিধবা গণের একেশ্বর বাদী পুত্র গণ পরস্পর কাটা কাটি, মারা মারি করিয়া পৃথিবী নরশোণিতে কর্দ্দমাক্ত করিতেছে কেন? রুসগণ আত্মকলহে উন্মত্ত হইয়া নিজেদের ধ্বংসের পথ মুক্ত ও শত্রুর বিজয়ের পথ প্রশস্ত করিতেছে কেন? মদদৃপ্ত জার্ম্মেণ জাতি International Law ভঙ্গ করিয়া যে তাণ্ডব লীলার অভিনয় করিতেছে, পৃথিবীর অন্য কোন সভ্য জাতি তাহা সমর্থন করিতে পারিতেছে কি? এই অকাল প্রণয়ের মূলীভূত কারণ জাতি ভেদ নহে,—ভোগ বিলাসের দারুণ স্পৃহা। বীরেন্দ্র বাবু যাঁহাদের অনুকরণ